রহস্যময় অভ্যুত্থান ও গণফাঁসি

জায়েদুল আহসান

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানের চেষ্টা ও সৈনিকদের গণফাঁসি নিয়ে একটি সিরিজ রিপোর্ট ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়। ওই রক্তাক্ত রহস্যময় অভ্যুত্থান নিয়ে এই রিপোর্টগুলো ছিল বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম রিপোর্ট।

সেই অভ্যুত্থানের চেষ্টার পর বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে গোপন বিচারে শত শত সৈনিক ও নন-কমিশন্ড অফিসারের ফাঁসি হয়, বিভিন্ন মেয়াদে হয় দণ্ড। ফায়ারিং স্কোয়াডেও বিনা বিচারে সেনা ও বিমানবাহিনীর বহু সদস্য প্রাণ হারান।

রিপোর্টগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গণফাঁসির শিকার পরিবারগুলো কেউ চিঠি দিয়ে, কেউ অফিসে এসে যোগাযোগ করে। তারা জানতে পারে কিভাবে কার পিতাকে, কার ভাইকে, কার স্বামীকে কবে কোথায় ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। জানতে পারে কোথায় তাদের লাশ দাফন করা হয়েছে। কিন্তু এসব তথ্য জানতে তাদের পার করে দিতে হয়েছে ২০টি বছর।

সেই সমস্ত স্বজনহারাদের একজন আলেয়া। যিনি তার স্বামীকে হারিয়েছেন। তখন তার কোলে একটি ছেলে, আর একজন অনাগত। সেই আলেয়ার ২০টি বছর কিভাবে কেটেছে? হৃদয়কে নাড়া দেয়া আলেয়ার সেই দুঃসহ যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হয়েছে 'রহস্যময় অভ্যুত্থান ও গণফাঁসি'।

জায়েদুল আহসান

প্রথাগত সাংবাদিকতার বাইরে ঘটনার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেই যিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। দুই যুগ ধরে যুক্ত আছেন সাংবাদিকতায়। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স করেছেন জায়েদুল আহসান। তবে ছাত্র অবস্থায়ই জড়িয়ে পড়েন সাংবাদিকতা পেশায়। বর্তমানে তিনি দেশ টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক। এর আগে ইংরেজি দৈনিক দ্যা ডেইলি স্টার ও তার আগে বাংলা দৈনিক ভোরের কাগজের চিফ রিপোর্টারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত স্বীকৃতি মিলেছে বারবার। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি প্রবর্তিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় বর্ষসেরা রিপোর্টারের পুরস্কার পেয়েছেন চারবার।

চর্চা বই
রাজনৈতিক গ্রন্থমালা-১

রহস্যময় অভ্যুত্থান ও গণফাঁসি
জায়েদুল আহসান

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১৫

প্রথম সংস্করণ : ২০০৮, পাঠসূত্র

অক্ষর বিন্যাস, অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ : রুনিক, পুরানা পল্টন

প্রকাশক :
চর্চা

পরিবেশক :

- সংবেদ, ৮৫/১ ফকিরের পুল, ঢাকা ১০০০
- সংহতি, ১০৯ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাঁটাবন, ঢাকা

দাম : ৩২০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-26046-5

আমার আব্বা
মরহুম আক্তারুজ্জামানকে
বইটি হাতে পেলে
যিনি খুশি হতেন
এবং আম্মাকে
যাঁকে ব্যথিত করেছিল
আলেয়ার কাহিনী

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নব্বইয়ের দশকে দৈনিক ভোরের কাগজ প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা একটি বিশেষ দিকে নজর দিয়েছিলাম, তা হলো বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া কিছু অজানা অধ্যায় সম্পর্কে অপ্রকাশিত ঘটনাবলি প্রকাশ করা। সেই লক্ষ্য থেকে আমরা '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও অভ্যুত্থান, ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-অভ্যুত্থান এবং ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থান বিষয়ে বহু প্রতিবেদন, স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশ করেছি। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যাকাণ্ড ও মেজর জেনারেল মঞ্জুর হত্যা নিয়েও আমরা বেশ কিছু তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করি। এরশাদের ক্ষমতা দখল নিয়েও বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এসব বিষয় নিয়ে পরবর্তী সময়ে বেশ ক'টি বইও প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময় ভোরের কাগজে এসব লেখালেখি পাঠকদের মাঝে বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশবাসীর মাঝেও এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

তবে আমরা সশস্ত্র বাহিনীর একটি ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত অধ্যায় নিয়ে দীর্ঘদিন কোনো তথ্যবহুল প্রতিবেদন করতে পারিনি। এ দেশের কোনো সংবাদপত্র এ নিয়ে আলোকপাত করেনি কখনো। সেটি ছিল '৭৭-এর ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থান এবং অভ্যুত্থান-পরবর্তী সামরিক বাহিনীর সদস্যদের গণফাঁসি কার্যকর করা।

ভোরের কাগজের সাংবাদিক জায়েদুল আহসান পিন্টু অনুসন্ধান করতে গিয়ে একপর্যায়ে কিছু তথ্য ও দলিল হাতে পান। এরপর নিজে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান করে ছয় পর্বের একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন তৈরি করেন। আমরা সেটি ১৯৯৭ সালে অক্টোবরে ভোরের কাগজে প্রকাশ করি।

এ ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর সর্বত্র ব্যাপক আলোচনা হয়। সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে একটি ঘটনায় এত ব্যাপক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং প্রহসনের বিচারে ফাঁসি কার্যকর করার করুণ কাহিনী পড়ে পাঠকরা শিহরিত হয়ে ওঠেন। প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত শত চিঠি আসে আমাদের কার্যালয়ে।

প্রতিবেদনগুলো ছাপা হওয়ার সময় যদিও তৎকালীন প্রবীণ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার বক্তব্য ছিল– রক্তাক্ত অভ্যুত্থান দমনে এ ধরনের শক্ত ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। তাঁরা অনুরোধ করেছিলেন প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ না করার জন্য। কিন্তু আমরা মনে করেছি ইতিহাসের এ অন্ধকার অধ্যায় প্রকাশ হওয়া উচিত। সত্য জানার

অধিকার সবারই আছে, ঘটনা যেখানেই ঘটুক না কেন। এসব চিন্তা করে প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ আমরা অব্যাহত রাখি। পরে ওই সময়ে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, যাঁরা স্বজন হারিয়েছিলেন, তাঁদের বক্তব্য আমরা ছেপেছি।

একটা কথা বলে রাখা দরকার, সাংবাদিক জায়েদুল আহসান পিন্টু সাহস করে তাঁর অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছেন। আমরা মনে করি এ অন্ধকার অধ্যায়টি নিয়ে আরো ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন। ওই ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনার সব তথ্যই প্রকাশ করা উচিত। কালো অধ্যায় থেকে বের হয়ে আসার জন্য, সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরের নৃশংসতা তুলে ধরার জন্য এসব উদ্যোগ দরকার।

ওই প্রতিবেদন প্রকাশের এক দশক পর আগের তথ্যগুলোর সঙ্গে আরো কিছু তথ্য সংযোজন করে সাংবাদিক জায়েদুল আহসান পিন্টু, বর্তমানে দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার চিফ রিপোর্টার একটি বই প্রকাশ করছেন। তাঁর উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আশা করবো, ভবিষ্যতে কোনো গবেষক এ নিয়ে আরো কাজ করবেন। ঘটনার পূর্বাপর ব্যাখ্যা ও তথ্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করবেন, দেশবাসীকে সব তথ্য ও ঘটনা জানাবেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের রক্তাক্ত ঘটনাবলি আর যেন না ঘটে।

মতিউর রহমান
সম্পাদক
প্রথম আলো
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

পূর্বকথা

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থান চেষ্টা ও সৈনিকদের ফাঁসি নিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়। ঐ অভ্যুত্থান নিয়ে এই প্রতিবেদনগুলো ছিল বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রথম রিপোর্ট। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর প্রকাশিত ঐ প্রতিবেদনগুলোতে তার পরও কিছু তথ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অনুসন্ধান একটি চলমান প্রক্রিয়া, আর যখন বিষয়টি হয় ইতিহাসভিত্তিক এবং সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কিত, তখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরো চলতে থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। প্রতিবেদনগুলো প্রকাশের পর দীর্ঘ ১০ বছরে আরো কিছু তথ্য-উপাত্ত হাতে আসে, মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ আসে অভ্যুত্থান-সংশ্লিষ্ট অনেকের।

ভোরের কাগজ-এর তৎকালীন সম্পাদক বর্তমানে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান রিপোর্টগুলো প্রকাশের পরপরই এ বিষয়ে একটি বই লিখতে বলেছিলেন। কিন্তু কিছু তথ্যের অভাবে তখন সেটা আর করা হয়নি।

আমার কাছে মনে হয়েছে সামরিক বাহিনীর এ বিশাল কালো অধ্যায়টি যা আমাদের অনেকের কাছেই এখনো অজানা। অভ্যুত্থান নিয়ে তৈরি করা প্রতিবেদনগুলো এবং পরবর্তী সময়ে পাওয়া তথ্যগুলোর একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। সময়ের আবর্তে তা যেন হারিয়ে না যায়, তাই সব তথ্য একসঙ্গে করে একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখার ইচ্ছা থেকেই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিই। আর বই আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে '৯৭-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোকে সময়োপযোগী করা এবং সংযোজন-সংশোধন-বিয়োজন ধারায় রিপোর্টিংটিকে যথাসম্ভব গ্রন্থ-উপযোগী করার চেষ্টা করেছি। সঙ্গে চেষ্টা করেছি একটি প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল পরিশিষ্ট দিতে, যাতে পাঠকের সূত্র খুঁজতে কোনো অসুবিধা না হয়।

প্রতিবেদনগুলো তৈরির পেছনে মতি ভাইয়ের ভূমিকা ছিল একজন সম্পাদকই শুধু নন, একজন সহকর্মী-বন্ধুর মতো। যেখানেই আটকে গেছি সেখানেই তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না– ১৯৯৭ সালের কোনো এক সময় রিপোর্টটি তৈরির জন্য সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এ জি মাহমুদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখা করার অনুমতি যখন মিলছিল না তখন নিজেকেই সম্পাদক পরিচয় দিয়ে এ জি মাহমুদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলাম। পরে মতি ভাইকে বিষয়টি জানালে তিনি আমাকে নিয়ে এ জি মাহমুদের বাসায় যান।

১০ বছর পর ওই প্রতিবেদনগুলোর ওপর ভিত্তি করে বইটি প্রকাশ করার মুহূর্তে আবার যখন মতি ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম ভূমিকা লিখে দেওয়ার জন্য, তিনি হাজারো ব্যস্ততার মাঝে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন এবং উৎসাহ দিলেন। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হয় অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্যকে, যিনি সাধারণত প্রচ্ছদ করেন না। তাঁকে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদটি করে দিয়েছিলেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই সাংবাদিক রাজীব নূরকে, যিনি বারবার তাগাদা দিয়ে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। সাংবাদিক রাকিব হাসনাত সুমন, রাশিদুল হাসান, শাখাওয়াত লিটন, শামীম আশরাফ, আশফাক ওয়ারেশ খান, আইয়ুব ভুঁইয়া, বন্ধু সাদিকুর রহমান চৌধুরী পরাগ বিভিন্ন রেফারেন্স খুঁজতে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি ঋণী।

প্রতিবেদনগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য এর উপস্থাপনাগত প্রয়োজনীয় সম্পাদনা, পরিমার্জনা এবং ভাষারীতির জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে ভোরের কাগজের তৎকালীন নির্বাহী সম্পাদক সুকান্ত গুপ্ত অলকের ওপর। ভোরের কাগজের কম্পিউটার বিভাগের প্রধান গোলাম কিবরিয়া মেকআপের কাজটি দ্রুত করে দেওয়ায় আমি তাঁর কাছেও ঋণী।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হওয়ার পর ২০০৮ সালেই বইটির প্রকাশিত সব সংখ্যা শেষ হয়ে যায়। আমার সংগ্রহে ছিল একটি কপি। সেটিও প্রখ্যাত মার্কিন অনুসন্ধানী সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ সংগ্রহে রাখবেন বলে তাকে দিতে হয়েছে। এরপর থেকেই নানাজন বইটি সংগ্রহ করতে চেয়েছেন, দিতে পারিনি। এমন অনেক ঘটনার একটির উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহের পর ঘটনার বিচার কিভাবে হবে তা নিয়ে বিচারাঙ্গনে বিতর্ক দেখা দেয়। একদল আইনজীবী বলছিলেন সেনা আইনে বিচার হবে, আরেক দল বলছিল প্রচলতি আইনে হবে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়ার জন্য রেফারেন্স পাঠান। সুপ্রিম কোর্ট দশজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবীকে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ দেন। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এগারোজন বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি হয়। শুনানির একপর্যায়ে অন্যতম অ্যামিকাস কিউরি ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম আমাকে ফোন করে বইটির কপি চান। তাঁকেও বইটি দিতে পারিনি। শুনানিতে বই থেকে রেফারেন্স দেবেন বলে তিনি যেকোনোভাবেই হোক বইটি চেয়েছিলেন। পরে প্রকাশকের কাছ থেকে এগারোটি ফটোকপি সংগ্রহ করে ব্যারিস্টার আমীর বিচারপতিদের হাতে দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া '৭৭-এর অভ্যুত্থানে নিহত অনেক পরিবারের সদস্যরা বইটি চেয়ে পাননি। বইটি লেখা শুরু হয়েছে গণফাঁসির শিকার কর্পোরাল আকবরের স্ত্রী আলেয়ার যাপিত জীবন নিয়ে, আকবর যখন বন্দি তখনই আলেয়া দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেন। ১৯৯৭ সালে যখন ভোরের কাগজে অভ্যুত্থান নিয়ে প্রতিবেদনগুলো প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বড় ভাইয়ের সঙ্গে

ওই তরুণ এসেছিল আমার কাছে বাবার অন্তর্ধান সম্পর্কে তথ্য জানতে। এসে জানতে পারে তাঁর বাবার ফাঁসি হয়েছে ২৬ অক্টোবর ১৯৭৭ সালে। সেই তরুণ আজ পুলিশ কর্মকর্তা। কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই এসে হাজির হয়ে আমার কাছে ওই বইটি কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চান। এভাবে অনেককেই যখন ফিরিয়ে দিতে হয়েছে, সেই মুহূর্তে প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজের টেলিফোন পাই। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের সেনা অভ্যন্তরের হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তার সঙ্গে '৭৭-এর অভ্যুত্থান নিয়ে আমার দীর্ঘ কথোপকথন হয়। বাংলাদেশের সেনা অভ্যন্তরে এত বড় অন্যায়-অবিচারের ঘটনা সকল মানুষের জানা দরকার বলে তিনি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ইংরেজিতে প্রকাশের পরামর্শ দেন।

এবার বন্ধু সাব্বির শামস এক রকম জোর করেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার উদ্যোগ নিয়েছে। বইয়ের ঘটনাগুলো যেহেতু আজ ইতিহাস, আর এই ইতিহাস যেহেতু আমাদের সামরিক বাহিনীতে ঘটে যাওয়া গণফাঁসির অন্ধকার অধ্যায়। সেই কালো অধ্যায় নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা ও নিবিড় অনুসন্ধান প্রয়োজন। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরও আমার অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য যে দুটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো দলিল-দস্তাবেজ আর ঘটনার সময়ের বা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার। এ দুইয়ের সংমিশ্রণের চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত করেছি সাবেক সেনাশাসক ও রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কারাগার থেকে লেখা একটি চিঠি, যাতে তিনি '৭৭-এর অভ্যুত্থানের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলেছেন। আরো যুক্ত করেছি গণফাঁসি যাদের হাতে কার্যকর হয়েছে তাদেরই একজন জল্লাদের বক্তব্য, যার হাতে অভ্যুত্থানে জড়িত অভিযোগে ৯৩ জনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল। আর লিফশুলজের একটি অনুসন্ধানী নিবন্ধের সংক্ষেপিত অংশ বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে। আশা করছি দ্বিতীয় সংস্করণটি আগের চেয়ে সমৃদ্ধ হবে। বন্ধু সাব্বির শামসের পাশাপাশি সাবরিনা ইসলাম ও খুরশীদ আলমকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এতজনের সহায়তা নিয়ে কতদূর করতে পেরেছি জানি না, তবে এ বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে হয়তো কোনো গবেষক বা বিশ্লেষক বইটিতে দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উদ্‌ঘাটন করবেন সামরিক বাহিনীর ভেতরে ঘটে যাওয়া গণফাঁসির অন্ধকার অধ্যায়টি। আমার বিশ্বাস ইতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সময়ের ব্যবধান কোনো বাধা হতে পারে না ।

জায়েদুল আহসান
ডিসেম্বর ২০১৪

সূচিপত্র

গণফাঁসি রহস্যের উৎসমুখে

একজন রিপোর্টার হিসেবে যেকোনো ঘটনার ভেতরে ঢুকে যাওয়ার ইচ্ছা সব সময়ই আমার মাঝে কাজ করে। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়টায় একের পর এক ঘটনাগুলো ঘটছিল। রাষ্ট্র ও সরকারে বড় হয়ে উঠলো সামরিক বাহিনী ও সামরিক সরকার। প্রায়ই সেনাবাহিনীর মধ্যকার অন্ধকার অধ্যায়গুলো সম্পর্কে বিশদভাবে জানার আগ্রহ আমার মাঝে উঁকি দিতো।

বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকা, বই-প্রবন্ধ ও নানা গবেষকের লেখায় '৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ৩ নভেম্বরে খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহ, ৭ নভেম্বরে পাল্টা বিদ্রোহ, '৮১ সালের ৩০ মে জিয়া হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কম-বেশি জানতে পেরেছি, যেন একটির পিঠে আরেকটি। শুধু জেনারেল জিয়ার আমলে ছোট-বড় ২১টি অভ্যুত্থান ঘটেছে বলে গবেষক ও বিশ্লেষকদের লেখায় তথ্যটি পেলেও বিশদ কিছুই জানতে পারিনি। রিপোর্টার হিসেবে যখন বিভিন্নজনের কাছে গিয়েছি তখনই একদিন জানতে পারি ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর সেনা ও বিমানবাহিনীর কিছু সদস্যের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা সম্পর্কে। ঐ ২১টি অভ্যুত্থানের আরো কিছু ঘটনা সম্পর্কে জানালেও ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানটি আমাকে নাড়া দেয় মারাত্মকভাবে। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান বা ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়া হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও '৭৭-এর সেই অভ্যুত্থানে অন্তত ক্ষমতাকেন্দ্রে এমন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু অভ্যুত্থান-চেষ্টার কারণে বিমান ও সেনাবাহিনীর শত শত সৈনিককে গণফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল, যা কিনা কখনই প্রকাশ হয়নি– গোপন বিচারে একরকম একতরফাভাবেই ফাঁসির রায় ধার্য ও কার্যকর করা হয়েছিল।

১৯৯৬ সালে আমি ইতিহাসের এই অন্ধকার দিকটির রহস্য উন্মোচনের কাজে লেগে পড়ি। কী ঘটেছিল '৭৭-এর ২ অক্টোবর, কেন ঘটেছিল, কারা ঘটিয়েছিল, কেন গণফাঁসি? লাশগুলো পর্যন্ত দেওয়া হলো না স্বজনদের কাছে, কতজনকেই বা ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল– সরকারিভাবে জানানো হয়নি কিছুই।

এতসব প্রশ্নের জবাব শুনতে গিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সন্ধান পাই '৭৭-এ গণফাঁসির একটি তালিকা। সেই তালিকার সূত্র ধরেই কুমিল্লা ও বগুড়া কারাগার থেকে

সংগ্রহ করি সেখানে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের নাম-পরিচয়। শুরু হয় অনুসন্ধানের পালা। সাবেক সেনা ও বিমানবাহিনী কর্মকর্তা, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের স্বজন, কারাদণ্ডিতদের সাক্ষাৎকার, কারা কর্মকর্তা, সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে অভিযুক্তদের অনেকের কাছেই যাই।

এভাবে প্রায় বছর দুয়েক অনুসন্ধানের পর ১৯৯৭ সালের ২ অক্টোবর থেকে ভোরের কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে আমার রিপোর্ট– '৭৭-এর রহস্যময় অভ্যুত্থান ও সৈনিকদের গণফাঁসি।'

রিপোর্টগুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন উৎস থেকে আরো কিছু তথ্য পেতে শুরু করি, গণফাঁসির শিকার পরিবারগুলো কেউ চিঠি দিয়ে, কেউ অফিসে এসে দেখা করতে থাকে। তারা আমার রিপোর্টের মাধ্যমেই জানতে পারে কারো পিতাকে, কারো ভাইকে, কারো স্বামীকে কবে কোথায় কিভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। জানতে পারে কোথায় তাদের লাশ দাফন করা হয়েছে। কিন্তু এসব তথ্য জানতে ইতোমধ্যে তাদের ২০টি বছর পার করে দিতে হয়েছে। আমি তাদের এই কষ্ট ও ক্ষোভের জায়গাটা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি।

সেই স্বজনহারাদের একজন আলেয়া, যিনি তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন। তখন তাঁর কোলে একটি ছেলে, আর একজন অনাগত। সেই আলেয়ার ২০টি বছর কিভাবে কেটেছে! একসময় মুখোমুখি হয়েছিলাম তাঁর, হৃদয়কে নাড়া দেয় তাঁর কাহিনী। আলেয়ার সেই দুঃসহ যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তাই শুরু করেছি এই মলাটবদ্ধ ইতিহাস।

সেই ফাঁসির পর

তখন হেমন্তকাল। ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে সন্ধ্যা নামে ঢাকার বুকে। হালকা কুয়াশা। মিরপুর সেনানিবাসে স্টাফ কোয়ার্টারের পশ্চিমের দেয়ালজুড়ে কমলা আভা ক্রমে কালো হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলেয়ার মুখেও আঁধার ঘনিয়ে আসে। কারণ আকবর এখনো ফেরেননি।

ছোট-বড় দুর্ঘটনার কাহিনী কানে আসে প্রায়ই। সেসব ভাবনায় মনটা অস্থির হয়ে ওঠে আলেয়ার। বুঝতে পারছেন না কী করবেন। আশপাশের ফ্ল্যাটগুলোতে খোঁজ নিয়েছেন বিকেলেই। কেউ কিছু বলতে পারে না। শুধু একটা চাপা গুঞ্জন– সেনা ছাউনিতে গোলমাল হয়েছে। ব্যস, এ পর্যন্তই। আর কোনো খবর নেই।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ান আলেয়া। ভাঙা কাচের টুকরোর মতো অজস্র তারা আকাশে। কত দিন হলো তাদের বিয়ে হয়েছে ! হ্যাঁ, তিন বছর। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায় ! মনির হয়েছে তাও দুই বছর পুরো হতে চললো। কদিনের মধ্যে আরো একজন আসছে। কী হবে কে জানে। আকবর যেমন চান একটা মেয়ে, আলেয়ারও তাই।

জানালাটা বন্ধ করে বিছানায় ফিরে আসেন আলেয়া। চোখ বুজে শুয়ে থাকেন। চারদিক নিঝুম হয়ে আসে। রাত বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে অস্থিরতা। বাইরে কোথাও একটা কুকুর কেঁদে ওঠে। মরা কান্না শুনে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে আলেয়ার। গলাটা শুকিয়ে আসে। সুরা-কালাম পড়ে ফুঁ দেন বুকে। হাত বুলিয়ে দেন মনিরের গায়ে। তারপর এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার শুয়ে থাকেন বিছানায়। এ রকম থাকতে থাকতে একসময় ডুবে যান তন্দ্রায়। আচ্ছন্ন তন্দ্রার মাঝে অস্পষ্ট দুঃস্বপ্ন দেখে থেকে থেকে ভেঙে যায় ঘুম। এলোমেলো ছেঁড়াখোঁড়া স্বপ্নটা আর কিছুতেই মনে করতে পারেন না। আবার তন্দ্রায় তলিয়ে যেতে যেতে একসময় রাত পেরিয়ে যায়। কাকভোরেই ঝটকা দিয়ে ভেঙে যায় ঘুম। সম্পূর্ণ চোখ মেলে আলেয়া প্রথমেই ভাবলেন– আকবর কাল ফেরেননি।

তখনো আলেয়া জানেন না, আকবর আর কোনোদিন ফিরবেন না।

....

আলেয়া ভাবতে চান, ঢাকার বুকে এই ধূসর পেঁচার মতো অন্ধকারটা হঠাৎ করেই খুব ঘন ঘন যেন নেমে আসছে। মনে পড়ে, ১৫ আগস্টেই একঝাঁক অন্ধকার মার্চপাস্ট করে ঢুকে গিয়েছিল এ দেশের রাজনীতিতে। শুরু হয়েছিল অন্য ইতিহাস। খুনের রাজনীতির হাত ধরে খুন, হিংসা, লোভ, ক্ষমতা দিনে দিনে ভয়ঙ্কর অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল এ দেশে। বাইরে তেমন টের পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেনা ছাউনিতে তা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় প্রতি মাসেই বিভিন্ন ছাউনিতে অভ্যুত্থানের চেষ্টা আর তা দমন– বারবার রক্তাপ্লুত করছিল সামরিক বাহিনীকে এভাবেই।

এ রকমই এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর। কে বা কারা এই অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিল তা আজও রহস্য। তবে আকবর নিশ্চয়ই নন। তিনি সামান্য কর্পোরাল মাত্র। বসদের হুকুমবরদার। বসরা যা করতে বলবেন তাই করবেন। তা ছাড়া ভোর রাতে যখন অভ্যুত্থান ঘটে, তখন তিনি স্টাফ কোয়ার্টারে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে একই শয্যায় ঘুমে অচেতন। অভ্যুত্থান কাহিনীর বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না। তাই অফিসে এসেই অভ্যুত্থানের দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে ভ্যাবাচেকাই খেয়ে গেলেন তিনি। তার মতো আরো শ শ বন্দি হলো।

সহকর্মীদের মাধ্যমে খবর পৌঁছে যায় আলেয়ার কানে। আকবর বন্দি। একপলক অবিশ্বাস, কিন্তু তারপরই অচেতন হয়ে ঢলে পড়েন আলেয়া। দুই দিন কেটে যায় এভাবে। তৃতীয় দিনে তার শূন্য শীতল কোলজুড়ে আসে শরীফউল্লাহ।

সন্তান কোলে অপেক্ষা করেন আলেয়া। হয়তো এর মধ্যে ছাড়া পেয়ে যাবেন। কিন্তু না, আকবর ফেরেন না। কোনো খোঁজখবরও নেই তার। কোথায় রাখা হয়েছে, কী তার অপরাধ কিছুই জানেন না আলেয়া। একে ধরেন, ওকে ধরেন, যাকে পান তাকেই শুধান। কোলে দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে ছুটে যান সেনানিবাসে। বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে! এ দপ্তর থেকে ও দপ্তর। এ টেবিল থেকে ও টেবিল। কেঁদেকেটে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকেন। কিন্তু কেউ কিছু বলে না। সবার মুখে কুলুপ আঁটা। সামান্য সহানুভূতিটুকুও দেখায় না কেউ।

এভাবে এক সপ্তাহ গেলো। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলও ফুরিয়ে আসে। এর মধ্যে অফিস থেকে লোকজন এসে বললো, কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। অকূল পাথারে পড়েন আলেয়া। স্বামী নেই, উপার্জন নেই, ঢাকায় থাকার মতো কোনো জায়গাও নেই, যেখানে থেকে আকবরের খোঁজ করবেন। অগত্যা আলেয়া কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান মেহেন্দীগঞ্জে।

কিন্তু অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়। মেহেন্দীগঞ্জে পা দেওয়ার পরপরই মারা যান আলেয়ার বাবা। সাত দিনের শরীফ আর মনিরকে নিয়ে আলেয়া আসেন শ্বশুরবাড়িতে। সেখানেও সান্ত্বনা নেই। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু আলেয়া নিরুপায়। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেও পড়ে থাকেন স্বামীর ভিটায়।

শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে যান প্রাণপণে। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতে নির্জনে অনেকক্ষণ বসে কাঁদেন। কাঁদতে কাঁদতে ভাবেন– ফিরে আসবেন আকবর, নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। জেল হলেও কত দিন আর! তারপর আবার নতুন করে সংসার সাজাবেন তারা।

কিন্তু আকবর ফেরেন না। ঠাঠা রৌদ্রের একদিন যেন বজ্রপাত নেমে আসে আলেয়ার মাথায়। ভগ্নদূতের মতো ডাকপিয়ন এসে দাঁড়ায় বাহির দরজায়। হাতে আকবরের কাপড়চোপড়, ১২টি টাকা আর বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে পাঠানো একটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত– '২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালে আকবরের মৃত্যুদণ্ড ধার্য করা হয়েছে।' ব্যস, এ পর্যন্তই। কবে, কখন, কোথায়, কিছুই আর লেখা নেই। কান্নার রোল ওঠে ভেতরঘরে। চিঠি হাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন আলেয়া। বিশ্বাস হয় না। আকবরের ফাঁসি হবে কেন? ফাঁসি হওয়ার মতো কাজ তিনি করতেই পারেন না! নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। আকবরের সহকর্মীদের কাছে আলেয়া চিঠি পাঠান সেদিনই। লোক পাঠান। কিন্তু কেউ কোনো খবর দিতে পারে না।

ছুটে যান আলেয়া নিজেই। বিমানবাহিনী, তারপর সেনাবাহিনী থেকে নৌবাহিনী। অফিস থেকে অফিসে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করেন। 'ভাই, আমার স্বামীর লাশটা কোথায়? লাশটা অন্তত দেন।' আহাজারি করে লুটিয়ে পড়েন আলেয়া। কোনো জবাব মেলে না। মেঝেতে বুটের আওয়াজ তুলে অফিসাররা হেঁটে যান ভ্রুক্ষেপহীন। পাথরে খোদাই করা মুখ। ভাবলেশহীন। স্বামীহারা একটি অসহায় নারীর আহাজারি তাদের বিচলিত করতে পারে না বিন্দুমাত্র। ফিরে আসেন আলেয়া।

....

দিন যায়– মরা স্রোতের মতো বয়ে যেতে থাকে। নিজের অজান্তেই একদিন শরীরে বিধবার পোশাক তুলে নেন আলেয়া।

এমনিতেই এ দেশে বিধবার 'ডান চাইতে ডান নাই/ বাঁও চাইতে বাঁও নাই।' আকবর আছেন– জানার পরও যে গঞ্জনা সইতে হয়েছে তাকে, এবার মৃত্যুদণ্ডের খবর পেয়ে তার মাত্রা চড়ে গেলো। 'বউয়েরে সেবিলে পুতেরে পাই'। সেই পুতই যখন নাই, তখন আর এই বউকে খামোখা রেখে লাভ কী? আলেয়ার শত অনুনয় কান্নাকাটি উপেক্ষা করে শ্বশুর-শাশুড়ি জোর করেই বের করে দিলেন তাকে ঘর থেকে। কিন্তু রেখে দিলেন তার নাড়িছেঁড়া ধন ছেলে দুটিকে। দুর্ভাগা ছেলে দুটি– বাপের ছায়া তো পায়নি কোনো দিনই, এবার মাকেও হারালো।

আলেয়ার দুর্ভাগ্য কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে উঠলেন এসে বাপের বাড়ি। কিন্তু সেখানেও ঠাঁই মেলেনি। বাবা তো নেই, ছিল ভাইয়েরা। কথায় বলে, মিত্রের সেবা আপন ভাই/তার ওপর শত্রুও নাই। সত্যিই তাই। আলেয়ার

ভাইয়েরাও একদিন সাফ সাফ জানিয়ে দিলো, আলেয়াকে তারা রাখতে পারবে না। সে যেন রাস্তা দেখে।

উপায়ন্তর না দেখে পাশের এক বাড়িতে ঠাঁই নিলেন আলেয়া। কাজ নিলেন মক্তবে। কাজ মানে ছাত্রছাত্রীদের কুরআন পড়ানো। বিনিময়ে এবেলা এর বাড়িতে, ওবেলা অন্য বাড়িতে গিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি। নিত্যভিক্ষা তনুরক্ষা'র মতো অবস্থা। আর সে যে কী লজ্জার! প্রথম প্রথম গলা দিয়ে নামতে চাইতো না ভাতের দলা। সহানুভূতির সঙ্গেই ডেকে বসিয়ে খাওয়াত সবাই। কিন্তু এক-একটা লোকমা মুখে তোলার সময়ই চোখ ভিজে উঠতো আলেয়ার– এ যে বড় করুণার, বুঝতে পারতেন ঠিকই কিন্তু কিছুই করার ছিল না।

মাস শেষে হাতে বেতনের গোনা টাকা নিয়ে আলেয়া ছুটে যেতেন শরীফ আর মনিরের কাছে। এটা-সেটা কিনে দিতেন। মাকে দেখেই ছুটে আসতো ওরা। কলকলিয়ে কত কথা তখন মা-ছেলেতে। কিন্তু আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। বিদায়ের শোকে আরো মলিন হয়ে উঠতো সেদিনের সন্ধ্যাবেলা। আবার একটা মাস কাটতো ঐ একটি দিনের অপেক্ষায়। কিন্তু দিন যায়। দিন থাকে না। মনির, শরীফও বড় হয়। স্কুলে যায়। ভালো রেজাল্টও করে। এর মধ্যে আলেয়ার শ্বশুর মারা যান। শরীফ, মনির একদিন জোর করে নিয়ে আসে তাদের মাকে। দুই ছেলের মাঝে এবার নিরাপত্তায়, স্বস্তিতে দিন কাটে আলেয়ার। ভুলে যান অতীতের শত লাঞ্ছনা আর কষ্টের কথা। দুচোখে স্বপ্ন ফের ডানা মেলে। ... দেখতে দেখতে গড়িয়ে যায় ২০টি বছর। আবারও ফিরে আসে সেই ২ অক্টোবর ১৯৯৭।

....

মেহেন্দীগঞ্জে রতন চৌধুরী নিয়মিত ভোরের কাগজ পড়েন। ২ অক্টোবর পত্রিকা পাওয়ার পর দ্রুত তার চোখ চলে যায় ডান পাশে। '৭৭-এর সেই ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিক প্রতিবেদন। দ্রুত খবর দেন তিনি শরীফদের বাড়িতে। পত্রিকা নিয়ে যান নিজেই। ছুটে আসেন আলেয়া। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন উদগ্রীব হয়ে। ২০ বছরের কৌতূহল ছাপিয়ে ওঠে দুই চোখে। মৃত্যুদণ্ড কি হয়েছিল আকবরের? কবে, কখন? পরপর দুই দিন পত্রিকা ঘেঁটেও হদিস মেলে না। কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে আলেয়ার। ছোট ছেলে শরীফকে তিনি ঢাকায় পাঠান– যা তো বাবা, ঢাকায় গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে আয় তো। শরীফের ব্যাকুলতা মায়ের চেয়ে কম নয়। জন্মের পর একবারও দেখেনি বাবাকে। ঢাকায় ছুটে আসে সে পরদিনই বড় ভাই মনিরের কাছে। মনির খালার বাসায় থেকেই ভাওয়াল কলেজে অনার্স পড়ে। সেও পত্রিকা দেখছে প্রতিদিন। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না বাবাকে। শরীফ আসার পর দুভাই মিলে ২২ অক্টোবর রাতে ভোরের কাগজ অফিসে চলে আসে। খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে। মলিন মুখে জানতে চায়– আপনাদের কাগজে নাকি ফাঁসির তালিকা ছাপা হচ্ছে? আমার বাবার নাম কি আছে? বড়

করুণ এই প্রশ্নে হেমন্তের রাত যেন সেদিন আরো মলিন হয়ে ওঠে।

শুকনো মুখে রিপোর্টার উঠে গিয়ে পুরোনো ফাইল খুঁজে দেখান তাদের। উদগ্রীব হয়ে দুভাই ব্যাজ নম্বর মিলিয়ে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে এক জায়গায় থমকে যায় চোখ। নিঃশব্দে চোখের কোল ভরে ওঠে জলে। হ্যাঁ, তাদের বাবাকে ১৯৭৭ সালে ২৬ অক্টোবর ফাঁসি দেওয়া হয়েছে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। কবর দেওয়া হয়েছে আজিমপুর গোরস্থানে।

নামের তালিকায় বাবার নামটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দুভাই। নীরবে নিঃশব্দে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে শরীফ আর মনিরের। তুমুল তোলপাড় করে বুকের ভেতরটা। এই একটু সংবাদের জন্যই তো কত দেন-দরবার, কত কাকুতি-মিনতি করেছে ওরা, ওদের মা। অথচ জানতে পারেনি। এইটুকুর জন্যই তো স্কুল-কলেজে ভর্তির সময় পিতার নামের ঘরে মরহুম লিখতে গিয়ে বারবার কেঁপে গেছে ওদের হাত। কেউ যখন জিজ্ঞেস করেছে কবে মারা গেছে তোমার বাবা? বলতে পারেনি ওরা। বোবার মতো চেয়ে থেকেছে। দাদা মারা যাওয়ার পর সবার সঙ্গে কবর জিয়ারত করতে গিয়ে মনে পড়েছে বাবার কথা। বাবার কবর কোথায়? কবর হয়েছে তো?

সব প্রশ্নের অবসান হলো ২০ বছর পর। চোখ তুলে বাইরে তাকায় শরীফ। অন্ধকার চারদিকে। লোডশেডিং চলছে। তার মধ্যে রাস্তাঘাটে গাড়িগুলো আলো জ্বালিয়ে অস্থিরভাবে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে ওরা পত্রিকা অফিস থেকে।

সেই রাতেই চিঠি পাঠিয়ে দেয় মনির তার মায়ের কাছে– আর চারদিন পর বাবার মৃত্যুদিবস। মিলাদ ও কুরআনখানির ব্যবস্থা করো। আমরা আসছি। দুদিন পরই লঞ্চে ওঠে। সন্ধ্যার দিকে ভেঁপু বাজিয়ে লঞ্চ ছেড়ে দেয় বরিশালের উদ্দেশ্যে। বাইরে তখন গভীর রাত। ধু-ধু অন্ধকার। তার মধ্যে একটানা ঘড় ঘড় আওয়াজ করে পানি কেটে চলে যায় লঞ্চ। কান পাতলে ঢেউয়ের শব্দ টের পাওয়া যায়। চুপচাপ বসে থাকে ওরা ডেকে, এককোণে। দৃষ্টি বাইরে নদীর বুকে। নদীতে ঢেউ আছে কিন্তু এই অন্ধকারে তা দেখা যায় না।

আলেয়ার এ কাহিনী কোথায় যেন
সবাইকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে!
ট্র্যাজেডির করুণ রস কেন এ দেশে
ইতিহাসের পরতে পরতে? সে কারণেই
কি আলেয়ারা বারবার চরিত্র হয়ে ওঠে
গল্প, উপন্যাস, নাটক বা চলচ্চিত্রে?
তবে এ সবই যদি জীবন-ইতিহাসের
প্রতিচ্ছবি হয়, তাহলে তার অন্তর্নিহিত
রূঢ় বর্ণনাটি কী? আলেয়া-আকবরের
ধূসর পাণ্ডুলিপি সেখানে কি নয় আরো
সাদামাটা বাস্তব! আকবর যে রাতে আর
ফিরছিলেন না, সে রাতে সেনা ছাউনিতে
গোলমালের খবরটি লোকমুখে আলেয়ার
কানে ঠিকই এসেছিল। অস্থির আলেয়া
তখন তার কিনারা করতে পারেননি।
২০ বছর পর স্বামী হারানোর দিনক্ষণ
প্রকাশ হলে জানতে পারেন কী এক
অন্যায় আকবরের জীবন কেড়ে নেয়।

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর সামরিক
বাহিনীতে রহস্যময় রক্তাক্ত অভ্যুত্থান
চেষ্টার পর বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে
গোপন বিচারে শত শত সৈনিক ও
নন-কমিশন্ড অফিসারের ফাঁসি হয়,
বিভিন্ন মেয়াদে হয় দণ্ড। ফায়ারিং
স্কোয়াডেও বিনা বিচারে সেনা ও
বিমানবাহিনীর বহু সদস্য প্রাণ হারান।
আকবর তাদেরই একজন।

ছিনতাই করা বিমান ঢাকায় ও ব্যর্থ অভ্যুত্থান

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ঢাকায় সামরিক বাহিনীর একটি অংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তৎকালীন সেনাশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের নির্দেশে গঠিত বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালের কথিত বিচারে সেনা ও বিমানবাহিনীর যেসব সদস্যকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ১৯৩ জনের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ ঘটনায় পূর্বাপর মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় এটা স্পষ্ট যে বিচারের আওতার বাইরেও অনেককে মরতে হয়েছে।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী দুই মাস এক হাজার একশ থেকে এক হাজার চারশ সৈনিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়েছিল। ঐ সময় শুধু ঢাকা ও কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে সৈনিকদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ঢাকায় ১২১ জন আর কুমিল্লায় ৭২ জনের ফাঁসি হয়। এ ছাড়া ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ শতাধিক সৈনিককে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। [১৯৮৭ সালে বিমানবাহিনী থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস' পুস্তিকার একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ঐ ঘটনার পর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ৫৬১ জন বিমান সেনাকে হারাতে হয়েছিল।]

আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাত দিয়ে ১৯৭৭ সালে ৩ অক্টোবর নিউইয়র্ক টাইমসে '100 Reported killed in Dacca Coup Attempt' শিরোনামে অভ্যুত্থান সম্পর্কিত একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

১৯৭৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্টে 'Bangladesh Executions : A Discrepancy' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয় : ১৯৭৮ সালের ১৯ জানুয়ারি স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠানো একটি গোপনীয় তারবার্তায় ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জানান, তাঁর পাওয়া তথ্য অনুসারে ২১৭ জন মিলিটারি সদস্যকে ক্যু প্রচেষ্টার পরবর্তীকালে হত্যা করা হয়।

'আমাদের মনে হয় মিলিটারি কোর্ট স্থাপনের আগেই সম্ভবত এদের ৩০-৩৪ জনকে হত্যা করা হয়'– বলেন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আলফ্রেড ই বার্গেনসেন।

এই উদ্ধৃতির পরই রিপোর্টার লুইস এম সিমন্স বলেন, চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের এই বক্তব্য

ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের রিপোর্টকেই সমর্থন করে। তাঁরা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি জিয়ার অনুগত সৈনিকরা কোর্ট মার্শালে বিচারের জন্য নেওয়ার আগেই অনেক বিদ্রোহীকে হত্যা করে।

লন্ডন টাইমসের ১৯৭৮ সালের ৫ মার্চ সংখ্যায় এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথোপকথনের বরাত দিয়ে বলা হয়, ঐ ঘটনায় সামরিক বাহিনীর আট শতাধিক সদস্যের সাজা হয় এবং প্রায় ৬০০ জনকে ফাঁসির মাধ্যমে কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়, যাদের অধিকাংশই বিমানবাহিনীতে ছিলেন। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ রচিত 'মিলিটারি রোল অ্যান্ড দ্য মিথ অব ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তাঁর লেখা 'Democracy and the Challenge of Development : A Study of Politics and Military Interventions in Bangladesh' গ্রন্থে ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানে ১৭ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া অভ্যুত্থানের দায়ে সেনাবাহিনীর ৪৮৮ জন সদস্যের হয় ফাঁসি নয়তো ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার তথ্য তিনি উল্লেখ করেন।

যেসব সেনা ও বিমান সৈনিককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাদের আত্মীয়-স্বজনকে না জানিয়ে, অতি গোপনে রাতের আঁধারে আজিমপুর কবরস্থানে তাদের ১২১ জন ও অপর ৭২ জনকে কুমিল্লায় দাফনের নামে মাটিচাপা দেওয়া হয়। ফাঁসির আসামিরা জানতে পারেননি কী ছিল তাদের অপরাধ! মৃত্যুর আগ মুহূর্তে শুধু তাদের সামনে রায় পড়ে শোনানো হতো। ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা সৈনিকদের আত্মীয়-স্বজনরা অনেকে এখনো জানেন না লাশ কোথায় দাফন করা হয়েছে।

অক্টোবরের সে অভ্যুত্থান কী কারণে, কাদের পরিকল্পনায় সংঘটিত হয়েছিল তা আজও অজ্ঞাত রয়েছে। তৎকালীন সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের বৃহৎ অংশ পরবর্তীকালে অভ্যুত্থানের কথা শুনলেও বিস্তারিত কিছুই জানতেন না। দেশবাসীর মতো তারাও অন্ধকারে ছিলেন।

অক্টোবরের ১ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ২ তারিখ ভোরে কর্নেল তাহেরের অনুসারী সেনা ও বিমান জওয়ানরা এক অভ্যুত্থানে অংশ নেয়, যা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপক রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে তৎকালীন সামরিক সরকার-সমর্থক সৈনিকরা ব্যর্থ করে দেয়। ঐ সময়ে পুরোনো তেজগাঁও বিমানবন্দরে জাপান এয়ারলাইন্সের একটি ডিসি-৮ বিমান জাপানি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'রেড আর্মি' কর্তৃক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৫৬ জন যাত্রীসহ বিমানটি বোম্বে (মুম্বাই) থেকে ব্যাংকক যাওয়ার পথে ছিনতাইকারীরা তেল নেওয়ার অজুহাতে বিমানটিকে ঢাকায় অবতরণ করায়। তারা জাপান সরকারের কাছে ৯ জন সহযোগী বন্দির মুক্তি ও ৬০ লাখ ডলার মুক্তিপণ দাবি করে। জাপান সরকার ও ছিনতাইকারীদের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর তৎকালীন

প্রধান এ জি মাহমুদ ছিনতাইকারীদের সঙ্গে অবিরাম ৮৬ ঘন্টা আলোচনা করে একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন। ১ অক্টোবর জাপান সরকার ছয়জন (তিনজন বন্দি আসতে অস্বীকৃতি জানায়) বন্দি ও ৬০ লাখ ডলার দিয়ে একটি বিশেষ বিমান পাঠায়। ২ অক্টোবর রাত ৯টা ১০ মিনিটে ছিনতাইকারীরা মুক্তিপণ নিয়ে বিমানসহ ঢাকা ত্যাগ করে। সঙ্গে নিয়ে যায় ২৪ জন যাত্রী। এ সমঝোতার পুরো ঘটনাটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল।

অপরদিকে ১ অক্টোবর দিবাগত রাতে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া সৈনিকরা ক্যান্টনমেন্ট, বিমানবাহিনীর অফিসার্স মেস, বিমানবন্দর ও রেডিও স্টেশনে সশস্ত্র হামলা চালায়। তারা অস্ত্রাগারে লুটতরাজ চালায়। কিন্তু সেখানে কোনো গোলাবারুদ ছিল না। সেগুলো আগেই জয়দেবপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস লিখিত 'এ লিগেসি অব ব্লাড' গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী, সিগন্যালম্যান শেখ আব্দুল লতিফ (সেন্ট্রির দায়িত্বে ছিলেন) প্রথম রাইফেলের ১ রাউন্ড গুলি ছোড়েন। গুলির শব্দ শুনে ব্যারাক থেকে সৈন্যরা বের হয়ে আসে। ঐ দিন শেষ রাতে ইউনিফরম ও সিভিল ড্রেসে সৈনিকরা ট্রাক ও জিপ নিয়ে এসে হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা করে যে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে, সবাই অংশ নিন। তারা ঘুমন্ত সৈনিকদেরও জোর করে ব্যারাক থেকে বের করে আনে।

এ সময় পুরো এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। অভ্যুত্থানকারী একদল সৈনিক পুরোনো বিমানবন্দরের টাওয়ার ভবনের ওপর দিকে হ্যাঙ্গারের সামনে লাইনে দাঁড় করিয়ে বিমানবাহিনীর সাতজন অফিসারকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে। আরো চারজন অফিসারকে বিমানবন্দর এলাকায় হত্যা করা হয়। সরকারি হিসাবে ঐ দিন বিমানের ১১ জন অফিসার ও অপর এক অফিসারের পুত্র এবং আরো ১০ জন সেনা সদস্য নিহত হয়। আহত হয় ৪০ জন।

বিমানবন্দর এলাকায় বিদ্রোহীরা হামলা চালানোর আগে রাতে ১২টা-১টার দিকে জেনারেল জিয়ার আবাসস্থলে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু জেনারেল জিয়া ঘটনা আগে থেকেই বুঝতে পেরে তার বাসভবনের চারদিকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্রোহীরা জিয়ার নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের প্রতিরোধে টিকতে পারেনি। পরে সেখান থেকে এসে বিভিন্ন স্থানে তারা এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। জিয়ার বাসভবনের আশপাশেও দুই পক্ষের সংঘর্ষে প্রচুরসংখ্যক সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে।

অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় অংশ নেওয়া সৈনিকদের একটি অংশ সকালে শাহবাগ রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। একজন সার্জেন্ট নিজের নাম-পরিচয় দিয়ে ভাষণ দেন। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা দেন এবং বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হবে, যার প্রধান হবেন তিনি নিজেই। তিনি সবাইকে সিপাহি বিপ্লবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান, কিন্তু নবম ডিভিশনের সদর দপ্তরের নির্দেশে সাভার ট্রান্সমিশন কেন্দ্র

বন্ধ করে দেওয়ায় দেশবাসী ঐ ভাষণ পুরোটা শুনতে পারেনি। নবম ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি জেনারেল মীর শওকত আলী মেজর আবেদিনকে রেডিও স্টেশন নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দেন। মেজর আবেদিন শেরাটন হোটেলের কাছে অ্যাম্বুশ করে রেডিও স্টেশন থেকে সৈনিকদের বের হয়ে আসার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেডিও স্টেশনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে বিমানবন্দর ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় যেসব সৈনিক বিদ্রোহে অংশ নেয়, তারা কুর্মিটোলায় বিমান সেনা ছাউনি থেকে বিমানবন্দরের দিকে ফিরে যাওয়ার পথে মহাখালীতে বাধা পায়। এখানে প্রচুর গোলাগুলি হয়, যাতে বহুসংখ্যক সৈনিক হতাহত হয়।

অন্যদিকে আরেকদল সৈনিক আগারগাঁও দিয়ে তেজগাঁও বিমানবন্দরের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে অগ্রসর হয়। তারাও সেখানে মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্রোহী সৈনিকদের আটক করা হয়। এভাবেই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যায়। ঐ দিনই প্রায় ২০০ সৈনিক নিহত হয়েছিল। যদিও এদের সবার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিছু লাশ তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। বাকি লাশ গুম করা হয়।

সে সময় বিমান ছিনতাই ঘটনায় সমঝোতার জন্য ঢাকায় এসেছিলেন জাপানের তৎকালীন ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী হাজিমি ইশি। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিমানবন্দরে অবস্থানকালে স্বচক্ষে ৫০টিরও বেশি লাশ দেখেছেন বলে দাবি করেছেন।

ঐ অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর সার্ভিস সেক্টরের কতিপয় সৈনিক (যেমন সিগন্যাল কোর, সাপ্লাই ইএমই, ইঞ্জিনিয়ার, অর্ডন্যান্স ও মেডিকেল কোর) এবং বিমানবাহিনীর কতিপয় সৈনিক সম্মিলিতভাবে অংশ নিয়েছিল। এর নেতৃত্বে ছিল মূলত সিগন্যাল কোরের সদস্যরা। বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে সার্জেন্ট আফসার ও সিগন্যাল কোরের হাবিলদার মুজিবর রহমান এ বিদ্রোহের সূচনা ঘটান।

আগে ফাঁসি, পরে কমিটি-কমিশন

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে তাতে জড়িত থাকার অভিযোগে চলতে থাকে ধরপাকড় ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। তথাকথিত বিচারের নামে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ও বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা ঘটে। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জুনিয়র কমিশন্ড ও নন কমিশন্ড শত শত অফিসার ও সাধারণ সৈনিকরা এ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। দ্রুত গঠিত বেআইনি সামরিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাদের অনেকের ফাঁসি কার্যকর হয়। এ সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়। সব কিছুই হয় অতি গোপনে। মাঝেমধ্যে আইএসপিআর-এর বিজ্ঞপ্তি ও জেনারেল জিয়া তার ভাষণের মাধ্যমে জনগণকে অতি আংশিক ধারণা দেন। পত্রপত্রিকায় এ-সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন নিষিদ্ধ করা হয়। বিদেশি বেতারসমূহে অভ্যুত্থানের খবর ও সামরিক অফিসারদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হলে কড়া প্রতিবাদ জানানো হতো।

এ অভ্যুত্থানের খবর ৮ অক্টোবর রাতে প্রথম বিবিসির মাধ্যমে দেশবাসী কিছুটা জানতে পারে। ঐ রাতে রয়টার্সের সংবাদদাতা বারনার্ড মিলনাস্কির উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি রেডিও একটি প্রতিবেদন প্রচার করে। মিলনাস্কি অক্টোবরের ২ তারিখ ঢাকায় ছিলেন, পরে দিল্লি চলে যান। সেখান থেকে তিনি বিবিসিতে প্রতিবেদন পাঠান। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'জাপানি বিমান ছিনতাইয়ের জিম্মি মুক্তিদানের আলোচনা যখন চূড়ান্ত, তখন সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহীরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালায়। বিদ্রোহীদের মধ্যে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত কতিপয় ব্যক্তিও ছিল। আপাতত মনে হয় যে অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য তারা বেশ উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছে। বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যখন জাপানি বিমান ছিনতাইকারীদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় তারা ক্যান্টনমেন্ট ও বিমানবন্দরে হামলা চালায়। এ ব্যর্থ অভ্যুত্থানে সেনা ও বিমানবাহিনীর অন্তত ১০০ জন জওয়ান অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অনুগত সৈন্যরা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু তার আগেই বিদ্রোহীরা বিমানবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে হত্যা করে।'

'বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস' (বিমানবাহিনী থেকে প্রকাশিত, ১৯৮৭) বইতে ঐ অভ্যুত্থানের দিনকে 'কালো দিন' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, বিদ্রোহ বেশিদূর এগোতে পারেনি, কেননা বিদ্রোহের নায়করা অন্যান্য ইউনিট থেকে সৈন্যদের

তাদের দলে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়। তবে এ বইতে সরকার নির্দেশিত বিশেষ সামরিক আদালতে বিচারে ও পরে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মোট ৫৬১ জন বিমানসেনা হারানোর ঘটনা ক্ষুদ্র বিমানবাহিনীর জন্য 'অতি অপূরণীয় ক্ষতি' বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে ঢাকায় অভ্যুত্থানের ঠিক আগের রাতে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে একটি ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। তাদের হাতে লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ হাফিজ ও সেনাবাহিনীর অপর একজন অফিসার নিহত হন। ঐ বিদ্রোহের প্রভাবও ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

এ দুটি অভ্যুত্থানের কোনো খবর এবং জড়িতদের বিচারের জন্য যে সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়, তার কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তৎকালীন সামরিক সরকার জনগণকে অবহিত করেনি। যদিও ১১ অক্টোবর জেনারেল জিয়া ৬০ জন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বৈঠকে ঘোষণা করেন, বগুড়া ও ঢাকার ঘটনাবলির উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করা হবে এবং জনগণকে ঘটনাবলির প্রকৃত সত্য জানানো হবে (সূত্র : ১২ অক্টোবর ৭৭, দৈনিক সংবাদ)।

৯ অক্টোবর সরকার আইএসপিআর-এর (আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর) মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জানায় যে বগুড়া ও ঢাকায় বাইরের শক্তির প্ররোচনায় সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে যে মিউটিনি হয় তার জন্য দায়ী সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিচারের উদ্দেশ্যে সরকার সামরিক আইন-বিধির অধীনে কয়েকটি মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায় থেকে নেওয়া পাঁচজন সদস্যের সমন্বয়ে প্রতিটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার শুরু করেছে (দৈনিক সংবাদ ১০ অক্টোবর '৭৭)।

সরকার যে রাতে ঐ বক্তব্য প্রচার করে সে রাতেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিযুক্তদের ফাঁসি কার্যকর শুরু হয়ে যায়। অবশ্য জেনারেল জিয়া ১৪ অক্টোবর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এর ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডসহ ট্রাইব্যুনালের সব রায় কার্যকর হচ্ছে। একই ভাষণে তিনি জাসদ, ডেমোক্রেটিক লীগ ও মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন সিপিবি– এই তিনটি রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেন।

এদিকে ঢাকা ও বগুড়ার অভ্যুত্থানের বিষয়ে সরকার ১৭ অক্টোবর বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে। ১৮ অক্টোবর আইএসপিআর-এর মাধ্যমে সরকার জানায়, 'ঢাকায় বিদ্রোহীদের মধ্যে স্থল ও বিমানবাহিনীর ৪৬০ জন ব্যক্তির বিচার হয়েছে। ৩৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। ২০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে, ৬৩ জন খালাস পেয়েছে, বিচার চলছে।' অপর ৩৪০ জনের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা জানানো হয়নি। অপরদিকে ২৬ অক্টোবর সরকার ইতিপূর্বে গঠিত তদন্ত কমিটি বাতিল করে দিয়ে বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি এ টি এম মাসুদের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। ঐসব কমিটি-কমিশন মূলত আন্তর্জাতিক চাপে করা হয়েছিল। ঐ কমিশন একটি

রিপোর্টও দেয়, কিন্তু জেনারেল জিয়া তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ কমিশন গঠনের আগেই তথাকথিত বিচারের মাধ্যমে অভিযুক্তদের ফাঁসি কার্যকর প্রায় শেষ হয়ে যায়।

অভ্যুত্থানের পরেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া নিজের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র বহিনীর ওপরতলায় দ্রুত রদবদল ঘটান। পাশাপাশি তিনি তার ক্ষমতার ভিত্তি সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভরশীলতার বাইরে রাজনৈতিকভাবে সম্প্রসারণে মনোযোগী হন।

এ পর্যায়ে জেনারেল জিয়া তার 'ঢাকা নিরাপদ করো' পদক্ষেপের অংশ হিসেবে অক্টোবর মাসেই ডিজিএফআই প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল আমিনুল ইসলামকে অবসর দিয়ে ব্রিগেডিয়ার মহব্বত জান চৌধুরীকে ঐ পদে নিয়োগ দেন। জেনারেল শওকতকে যশোর ৫৫ ডিভিশনের জিওসি এবং জেনারেল মঞ্জুরকে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি করে চট্টগ্রামে বদলি করেন। ঐ সময়ে এ দুই জেনারেলের মাঝেও বিরোধ চরমে পৌঁছেছিল। আবার দুজনেই অভ্যুত্থান ও পরবর্তী ঘটনার জন্য জেনারেল জিয়াকে দায়ী করেছিলেন। এ ছাড়া ব্রিগেডিয়ার এম নূরউদ্দীনকে কুমিল্লা ব্রিগেডে এবং জেনারেল এইচ এম এরশাদকে ঢাকা ডিভিশনের জিওসি নিযুক্ত করেন। ৪৬ ব্রিগেডকে নবম ডিভিশনের অধীন করা হয়। বগুড়ায় অবস্থানরত ২২ বেঙ্গল বিলুপ্ত করা হয়। বিমানবাহিনীর প্রধান এ জি মাহমুদের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক এমাজউদ্দিন তাঁর 'মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য মিথ অব ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, অক্টোবরের অভ্যুত্থানের পরপর জেনারেল জিয়া 'ঢাকা নিরাপদ করো' পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক শক্তিগুলোয় তার ক্ষমতার ভিত্তি দৃঢ় করার উদ্যোগ নেন। সে ধারাবাহিকতায়ই তিনি পরে বিএনপি গঠন করেন।

টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গণফাঁসি, কার্ফ্যুর মধ্যে দাফন

'৭৭-এর ২ অক্টোবর অভ্যুত্থান দমনের পর থেকেই সশস্ত্র বাহিনীর সহস্রাধিক সদস্যকে কোনো কিছু না জানিয়ে কর্তব্যরত অবস্থায় আটক করা হয়। এদের প্রায় সবাইকে পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। কারাগারে ঠাঁই না পাওয়াদের রাখা হয় সেনানিবাসের ভেতরে বিভিন্ন নির্যাতন সেলে।

তাদের হাত-পা-চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে দিনের পর দিন আটকে রাখা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের নামে চলতো অকথ্য নির্যাতন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ছোট্ট একটি কক্ষে ৫০-৬০ জনকে একই সঙ্গে রাখা হতো। অপরদিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের ৭ অক্টোবর থেকে সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য শুরু হয়। বন্দিদের এই বিচার চলে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেওয়ার জন্য প্রতিদিন কারাগার থেকে বাস ভর্তি করে সশস্ত্র প্রহরায় তাদের সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনা হতো।

সামরিক আদালতের রায় প্রতিদিন রাত ৯টার মধ্যে বন্দি সামরিক ব্যক্তিদের জানানো হতো। যাদের ফাঁসির আদেশ হতো তাদের সঙ্গে সঙ্গে 'কনডেমড সেলে' পাঠানো হতো। রায় জানানোর রাতেই কিংবা পরের রাতে তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হতো।

অভিযুক্তদের রায় শোনানোর সঙ্গে সঙ্গেই আর্তচিৎকার শোনা যেতো, 'হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো আমি কোনো অপরাধ করিনি। যে জালেম আমার ফাঁসি দিচ্ছে তারও যেন এমন মৃত্যু হয়' ইত্যাদি। ফাঁসির পর লাশ ড্রপ করার শব্দ শুনেই পার্শ্ববর্তী সেলের বন্দিদের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যেতো।

'৭৭-এর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কারাগারগুলোতে যখন সন্ধ্যা নেমে আসতো তখন প্রতিটি কক্ষ থেকে ভেসে আসতো গগনবিদারী কান্নার রোল। সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে কারা কর্তৃপক্ষ এতই তড়িঘড়ি করে ফাঁসি দিচ্ছিল যে একই নামের একজনকে ফেলে অন্যজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। পশুপাখির মতো, জোর করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গলায় রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। প্রাণ যাওয়ার আগেই হাত-পায়ের রগ কেটে ফেলা হতো। কারাগারের ড্রেনগুলো সৈনিকদের রক্তে ভরপুর হয়ে যেতো।

৯ অক্টোবর থেকে প্রতি রাতেই তিন বা চার ড্রপে (প্রতি ড্রপে দুজন করে) ফাঁসি দেওয়া হতো। রাত ১২টার পর থেকে ৩টা পর্যন্ত ফাঁসি কার্যকর হতো। প্রতি রাতে যে কজনের

ফাঁসি হবে তার সংখ্যা সূত্রাপুর ও লালবাগ থানার ওসিকে জানিয়ে রাখা হতো। সূত্রাপুর থানার ওসি কাফনের ব্যবস্থা করতেন আর লালবাগ থানার ওসির দায়িত্ব ছিল দাফনের ব্যবস্থা করা। রাত সাড়ে ৩টায় একটি ট্রাক কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে আসতো। ট্রাকে করে লাশ আজিমপুর কবরস্থানে পাঠানো হতো। আগে থেকেই ঠিক করে রাখা সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকজন শ্রমিক কবর খুঁড়ে রাখতো। কোনো সময় জানাজা হতো আবার কোনো সময় জানাজা ছাড়াই লাশ দাফন হতো। ভোর হওয়ার আগে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরায় লাশ দাফনের কাজ শেষ করা হতো। দাফনকৃতদের মধ্যে দুজন হিন্দুর লাশও ছিল। অবশ্য এর আগে জেল ডাক্তার নামকাওয়াস্তে লাশের ময়নাতদন্ত করতেন।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসি দেওয়া হয় না। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। অনেক অসুস্থ, অর্ধমৃত ব্যক্তিকেও ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল।

যাদের কবর খোঁড়ার কাজ দেওয়া হয়েছিল, তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছিল, কেউ যেন এ খবর জানতে না পারে। কবর খোঁড়ার সময় শ্রমিকরাও আহাজারি করতেন, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন– এত লাশ আসে কোত্থেকে। ৯ অক্টোবর থেকে শুরু করে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি আর আজিমপুরে দাফন চলতে থাকে।

ঐ সময় ঢাকায় রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কার্ফ্যু বলবৎ ছিল। এই কদিনের মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১২১ জনের ফাঁসি কার্যকর হয়। তাদের সবাইকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। সামরিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে ফাঁসির আসামির সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি দিয়ে কুলিয়ে উঠতে না পারায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে ২৯ অক্টোবর '৭৭ থেকে ২৭ জানুয়ারি '৭৮-এর মধ্যে ৭২ জনের ফাঁসি কার্যকর হয়।

ফাঁসি দ্রুত কার্যকর করতে গিয়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকেও ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার নজির আছে। যেমন কর্পোরাল আফতাব নামের এক ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হয়, কিন্তু একই নামে অপর এক কর্পোরালকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গেলে তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন তার ফাঁসির আদেশ হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাজ নম্বর মিলিয়ে দেখার পর তিনি বেঁচে যান।

এদের কী কারণে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে কিংবা তারা কোথায় আছেন এ ধরনের কোনো সংবাদ তাদের আত্মীয়-পরিজনকে জানানো হয়নি। ফাঁসি হওয়ার বছর খানেক পরেও অনেকের আত্মীয়-স্বজন নিহতদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়েছিলেন। সিপাহি নিজামউদ্দিনের (ব্যাজ নং-৬৮৬৪৩৩) ভাইয়ের ছেলে নাসিরউদ্দিন তার চাচার ফাঁসি হওয়ার পর তাদের বাড়িতে এ রকম ওয়ারেন্ট পান, যাতে

বলা হয়, নিজামউদ্দিন অস্ত্রসহ পালিয়ে গেছে। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় কর্পোরাল খিরাজের বাসায় চিঠি পাঠানো হয় যে, খিরাজ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মারা গেছেন। কর্পোরাল খিরাজের পুত্র মনিরুজ্জামান মল্লিক তার মায়ের কাছ থেকে শুনেছে এ কথা। মনিরুজ্জামানের বয়স ছিল তখন মাত্র তিন-চার মাস।

সার্জেন্ট তোফাজ্জল হোসেনের (বিডি ৭৭০৪৫) স্ত্রীকে বিমানবাহিনীর রেকর্ড অফিস থেকে ২৮ ডিসেম্বর '৭৭ তারিখে স্কোয়াড্রন লিডার এম জামসেদ আলী স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে জানানো হয়, 'তোফাজ্জল হোসেন অক্টোবরের ১ ও ২ তারিখের ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালে তার সাজা হয়েছে। সাজার পর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী খবর যথাসময়ে জানানো হবে।' অথচ ১০ অক্টোবর '৭৭ তারিখেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তোফাজ্জল হোসেনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুর রশীদের (ব্যাজ নং-৭২৯৮০) স্ত্রী মাহফুজা রশীদ ২ অক্টোবরের পরবর্তী ছয় মাস জানতেন না তার স্বামী কোথায়। অনেক পরে শুনেছেন ফাঁসি হয়েছে। কিন্তু কবে? নানা দপ্তরে যোগাযোগ করেও জানতে পারেননি। এই লেখকের কাছে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'মৃত্যু দিবসটাও পালন করতে পারি না।'

অতি দ্রুত ফাঁসির জন্যই সামরিক ট্রাইব্যুনাল

অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়া বিদ্রোহী সৈনিকদের বিচার করার জন্য যে বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন তা ছিল মূলত দ্রুত ফাঁসি কার্যকর করার জন্যই। কারণ, বাংলাদেশে আর্মি ও এয়ারফোর্স অ্যাক্ট অনুযায়ী শুধু জেনারেল কোর্ট মার্শাল মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। এ রকম কোর্ট মার্শালে বিচারক হিসেবে কমপক্ষে পাঁচজন অফিসার থাকতে হবে।

মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন কোর্ট মার্শালে বিচারকদের একজন অন্তত লে. কর্নেল থাকবেন এবং বাকি চারজনের কেউ ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের নিচে হতে পারবেন না। এবং ক্যাপ্টেনদেরও প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি কমপক্ষে তিন বছর হতে হবে। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া এ ধরনের নিয়মমাফিক কোর্ট গঠনের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন, তাও দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সশস্ত্র বাহিনীর আইনও এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মার্শাল ল' অর্ডারে রাতারাতি মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন। ঐসব ট্রাইব্যুনালে নন-কমিশন্ড অফিসার ও সৈনিকদেরও বিচারক হিসেবে রাখা হয়। বিচারের নামে তারা আসলে হুকুম তামিল করেন মাত্র।

৭ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল গঠন হয় আর ৯ অক্টোবরই ফাঁসি কার্যকর শুরু হয়। এক দিনের ব্যবধানে বিচারপর্ব ও ফাঁসি কার্যকর করার মধ্যেই বোঝা যায়, দ্রুত ফাঁসি দেওয়াটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। মাত্র দুই দিনে অর্ধ শতাধিক সৈনিকের বিচারপর্ব ও ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তিপ্রাপ্ত সৈনিকদের কাছে এ সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার নিতান্তই প্রহসন। এর সত্যতা পাওয়া যায় সার্জেন্ট কবীরের ফাঁসির ঘটনায়।

সার্জেন্ট কবীর আহমেদ (ব্যাজ নং-৭৩৩০১) ২ অক্টোবর স্কাই মিলিটারি ডিউটি শেষ করে বিমানবন্দরে আসেন। এসেই পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সিওডিতে যান অস্ত্র জমা দিতে। কিন্তু গিয়ে দেখেন অস্ত্রাগার লুট হয়ে গেছে। তাই তিনি অস্ত্র জমা না দিয়ে তা নিজের কাছেই রেখে দেন। এই অভিযোগে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ২১ নভেম্বর কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার ফাঁসি কার্যকর হয়।

জেনারেল জিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী ৭ অক্টোবর থেকে ট্রাইব্যুনাল গঠন শুরু হয়। ১৮টি

সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল। প্রতিটি ট্রাইব্যুনালই সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। অভিযুক্তদের মাঝে ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে যেহেতু সব অভিযুক্তই নন-কমিশন্ড অফিসার, তাই তাদের সুবিচারের স্বার্থে ট্রাইব্যুনালে সাধারণ সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তরা যেন বলতে না পারেন, বিচার একতরফাভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এমনই একটি সামরিক ট্রাইব্যুনালের উদাহরণ হলো– মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনাল নং-১৮, ঢাকা কেস নং-১/১৯৭৭, তাং ৮ অক্টোবর ১৯৭৭। জজ : (১) লে. কর্নেল কাজী সলিমুদ্দিন মো. শাহরিয়ার (২) সুবেদার মো. আব্দুল হালিম (৩) নায়েক সুবেদার আব্দুল হাকিম (৪) হাবিলদার আনোয়ার হোসেন (৫) হাবিলদার এন এফ আহমেদ। অভিযুক্তরা হলেন– (১) ৬২৭৪০২৮ নায়েক এনামুল হক (২) ৬২৮৪৫৪ সিগন্যালম্যান কাজী সাইদ হোসেন (৩) ৬২৮১১৮৬ নায়েক আব্দুল মান্নান (৪) ৬২৮৪৭৩৬ সিগন্যালম্যান এস কে জাবেদ আলী। বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল এই চারজনকেই ফাঁসির আদেশ দেয়। ৯ অক্টোবর জেনারেল জিয়া ঐ আদেশের অনুমোদন দেন। ১৬ অক্টোবর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাদের ফাঁসি হয়।

অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার অভিযোগে আট বছরের সাজা হয়েছিল কর্পোরাল আনোয়ার ঠাকুরের। তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, কুর্মিটোলা ব্যারাক থেকে সেনা সদস্যরা তাকে প্রথমে তৎকালীন নবম ডিভিশনের সদর দপ্তরে নিয়ে যায়। সেখানে ১৫-২০ দিন অমানুষিক নির্যাতন চলে তার ওপর।

তিনি বলেন, নবম ডিভিশনে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় তুলে দেওয়া হয় বিমানবাহিনীর হাতে। তখন আবারও তাকে আটক করে তারা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে ড্রাম ফ্যাক্টরির পাশে এয়ার সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে আসা হয়। এখানে গোপন বিচার চলে। বিচারে হাজিরা দেওয়ার পর হাত-পা-চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে মদ্যপ অবস্থায় কতিপয় লোক তাঁর ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। চোখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতন কেন্দ্রের সবার কাছ থেকে সই নেওয়া হয়। কিছুদিন পর অভিযোগ গঠন করা হয়। ট্রাইব্যুনালে হাজিরার সময় নির্যাতিতদের চাদর দিয়ে জড়িয়ে রাখা হতো যেন নির্যাতনের চিহ্ন দেখা না যায়। বিচারকরা আনোয়ার ঠাকুরের চেহারা ও ব্যাজ নম্বর দেখে বললেন, 'তোমার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে'। এই পরোয়ানা নিয়েই তিনি কারাগারে যান। মাসখানেক পর জানতে পারেন তার সাজা হয়েছে আট বছর। তিনি আরো জানান, মোট ১২ জনকে ঐ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছিল। এর মধ্যে আটজনেরই ফাঁসি হয়।

কর্পোরাল নূরুল ইসলাম জানান, তার সাজা হয়েছিল চার বছর। ২ অক্টোবর অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সংসদ ভবনসংলগ্ন নবম ডিভিশনের সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় ১০ অক্টোবর। ট্রাইব্যুনালের প্রধান ছিলেন মেজর খালেক। তবে কোনো অভিযোগ না পেয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে ১৬ অক্টোবর আবারও গ্রেপ্তার হন তিনি। চোখ বাঁধা অবস্থায় বন্দি থাকেন চার দিন। ২০ অক্টোবর

আবারো সামরিক ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। উইং কমান্ডার সাবিরউদ্দিন আহমেদ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ছিলেন। ট্রাইব্যুনালে তার বিরুদ্ধে কর্পোরাল গাজীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয়। গাজীর ভাষ্যমতে, তিনি ভেবেছিলেন, নূরুল ইসলামের ফাঁসি হয়ে গেছে, তাই তার নাম বলে নিজে নির্যাতন থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালে নূরুল ইসলামকে দেখার পর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তার জবানবন্দি প্রত্যাহার করতে চান। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল তাতে রাজি হয়নি। অবশেষে দুজনেরই চার বছর সাজা হয়।

কর্পোরাল কুতুবর রহমান বলেন, 'কী কারণে যে আমার ২০ বছর সাজা হয়েছিল তা আজও জানতে পারিনি। কতজন সহকর্মীকে হারিয়েছি। তাজুল, কবির এরা কত ভালো লোক ছিল! তাজুলের বাবা তো পরে পাগল হয়েই মারা গেলেন।'

এভাবেই ৭ অক্টোবর থেকে শুরু করে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার চলতে থাকে। এই ২০ দিনে দুই সহস্রাধিক সৈনিকের বিচার সম্পন্ন করা হয়। ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের করার কিছুই ছিল না, যেভাবে নির্দেশ আসতো সেভাবেই রায় ঘোষণা করতে হতো। একটি ট্রাইব্যুনালের প্রধান ছিলেন– এমন একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা বলেন, 'যে অন্যায় ও অবিচারের রায় দিয়েছি, তার জন্য এখনো দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি।'

বিমানবাহিনীর একজন সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'সুবিচার হওয়া তো দূরের কথা, সেটাকে কোনো রকম বিচারই বলা যায় না। যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তারা যে সবাই দোষী তা ঠিক নয়।'

ঐ ঘটনায় যাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডিত করা হয়েছিল তারা পর্যায়ক্রমে ১৯৮৪ সালের ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি পান। '৯৭ সালে ২ অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, 'জেনারেল জিয়াউর রহমান ঘোষিত মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালগুলোতে বিচার প্রহসনের সময় এক-একজন সৈনিকের জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত নিতে গড়ে এক মিনিটেরও কম সময় নিয়েছিলেন তৎকালীন ট্রাইব্যুনাল প্রধানরা।'

এদিকে ঐ ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে কতজন প্রাণ হারিয়েছিল তার সঠিক হিসাব এখনো জানা যায়নি। কারাগারে ফাঁসি দেওয়া ছাড়াও ফায়ারিং স্কোয়াড বা অন্য কোনোভাবে যে অনেকের প্রাণহানি ঘটানো হয়েছিল তা বোঝা যায় বগুড়া অভ্যুত্থানে জড়িতদের বিচারের মাধ্যমে। ২৬ অক্টোবর '৭৭ আইএসপিআর-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, ঐ অভ্যুত্থানে জড়িত ৫৫ জনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। অথচ বগুড়া কারাগারে ফাঁসি হয়েছে ১৬ জনের। অপর ৩৯ জনকে কোথায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি কোনো সূত্র থেকেই। অন্য কারাগারগুলোতে এর কোনো নথিপত্রও পাওয়া যায়নি।

ঠিক কী কারণে ঐ অভ্যুত্থান হয়েছিল তার সঠিক ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। তৎকালীন সেনা কর্মকর্তাদের কেউ কেউ বলেছেন, কর্নেল তাহেরের সমর্থকরা জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে ঐ অভ্যুত্থান করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, জেনারেল জিয়া সশস্ত্র বাহিনীতে তার শত্রুদের চিহ্নিত করার জন্য অভ্যুত্থানের নাটক সাজিয়েছিলেন।

*২ অক্টোবর '৭৭-এর অভ্যুত্থানের
শিকার হলেন আকবর। ভুক্তভোগী
আলেয়া। আকবরের প্রাণপাত ঘটেছিল
জান্তা শাসকদের অবিমৃষ্যকারিতার
কারণে। আলেয়ার সাদা কাপড়, শরীফ-
মনিরের হাহাকার এর আরেক দিক।
কিন্তু আরো শিকার যারা : সেই শরীফ,
রুহুল আমিন, আনোয়ার, নুরুল
ইসলাম– যাদের আকবরের মতো
জীবনপাত না ঘটলেও নির্যাতন,
কারাদণ্ড ও চাকরিচ্যুতি তাদের
করেছে হতভাগ্য। তাই তাদের
হাহাকারেও প্রতিধ্বনিত হয় আলেয়ার
ট্র্যাজেডির সুর।
২০ বছর পরে যখন মুখোমুখি হই
তখন তাদের একটাই কথা– সেই
বিভীষিকাময় দিনগুলোকে তারা আর
কখনো স্মরণ করতে চান না। মনে হয়
নিরপরাধ বিদেহী আত্মারা বিদ্রূপ
করছে। যেন তারা বলছে– আর কত
নিজের সঙ্গে প্রতারণা? সত্যকে আর
কত দিন চাপা দিয়ে রাখা?*

১ মিনিটেই জীবনের ফয়সালা করে দিলো ট্রাইব্যুনাল
—কর্পোরাল আনোয়ার ঠাকুর

১৯৭৭-এর ২ অক্টোবর, ভোর তখন প্রায় ৪টা হবে। হঠাৎ গোলাগুলি আর হইচইয়ের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখি ব্যারাকে কেউ নেই। সবাই এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছিল। ব্যারাকের ভেতর থেকে গুলির আওয়াজের সঙ্গে হুঁশিয়ারি ভেসে আসছিল– 'যাদের ব্যারাকের ভেতর পাওয়া যাবে তাদের কুকুরের মতো গুলি করে মারা হবে।' ব্যাপারটা কী তা আঁচ করতে পারছিলাম না। আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কারণ পেটের ব্যথাটা আবার তীব্রতা লাভ করছিল। এমন সময় কালো পোশাকে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত কে একজন তার ভারী বুটের লাথি দিয়ে আমাকে খাট থেকে ফেলে দিলো। মাটিতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি 'ছদ্মবেশী'র কাঁধে ঝোলানো স্টেনটা ততক্ষণে আমার দিকে তাক করে রেখেছে, আর অশ্লীল উর্দুমিশ্রিত বাংলায় গালি দিতে দিতে হত্যার হুমকি দিয়ে আমাকে ইউনিফরম পরতে বলছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনো প্রকারে ইউনিফরম পরে 'ছদ্মবেশী'র হুকুম তামিল করলাম। বাইরে দণ্ডায়মান বাসগুলোতে একটিতে উঠে বসলাম। বাস ছাড়লো কুর্মিটোলা বিমানবাহিনী ক্যাম্প থেকে। সিওডি হয়ে সোজা বিমানবাহিনীর তেজগাঁও গার্ডরুমে এসে বাস থামলো।

ইতোমধ্যে ভোর হয়ে গেছে। দিনের আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল আর্মি আর এয়ার ফোর্সের ছেলেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। শুনতে পেলাম বিমানবন্দরে কয়েকজন অফিসারকে কারা যেন গুলি করে মেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছিল না। কারণ বিমানবাহিনীর অফিসার মারার মতো এমন কোনো পরিস্থিতি বিমানবাহিনীতে কখনো হয়নি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম বিমানবাহিনীর খ্যাতনামা পাইলট সাইফুল আজম (গ্রুপ ক্যাপ্টেন)সহ আরো কয়েকজন অফিসারকে বিমানসেনা তেজগাঁও ক্যান্টিনের পেছন দিকে নিয়ে গেলো। তাদের নেতৃত্বে তখন সার্জেন্ট আফসারকে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে। আমি তখন পেটের ব্যথায় আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাই ক্যান্টিনের সামনেই মাটিতে বসে পড়েছিলাম ও সুযোগ খুঁজছিলাম কিভাবে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া যায়। এভাবে ১৫-২০ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলো, হঠাৎ একটি ট্রাক এলো, তাতে সামনে কয়েকজন অফিসারকে বসে থাকতে দেখলাম। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না ট্রাকটি কুর্মিটোলা ক্যাম্পেই যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকে উঠে পড়লাম এবং কুর্মিটোলা নেমে মেসে গিয়ে নাশতা খেয়ে ব্যারাকে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি। সংক্ষেপে এই ছিল ১৯৭৭-এর ২ অক্টোবরের সাজানো অভ্যুত্থান নাটকে আমার ভূমিকা।

তারপর শুরু হলো অপরাপর দৃশ্য। তৎকালীন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ (অব.) কুর্মিটোলা ফুটবল মাঠে সব বিমানসেনাকে জড়ো করে অনেক কথা বললেন। মাথার ওপর তখন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছিল। তাঁর অভিযোগ– বিমানসেনারা তাঁর ভগ্নিপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন রাস মাসুদকে কেন মারলো! তিনি একথা কোনোভাবে অনুধাবন করতে চাইলেন না যে ঐ ১১টি মূল্যবান প্রাণের জন্য বিমানবাহিনীর গুটিকয়েক দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর সবাই মর্মাহত এবং সবাই একবাক্যে ঐ হত্যার বিচার চেয়েছিল। তিনি দীর্ঘ এক ঘণ্টা লম্ফঝম্ফ দিয়ে যাওয়ার সময় হুঁশিয়ার করে গেলেন যে কেউ যেন ক্যাম্প ত্যাগ করার চেষ্টা না করে। কেননা সমগ্র ক্যাম্পকে আর্মি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে ভারী কামানের গোলার আঘাতে আমাদের ক্যাম্প উড়ে যেতে পারে। ততক্ষণে আর বুঝতে বাকি থাকলো না যে বিমানবাহিনী ধ্বংস হতে আর বাকি নেই।

আমরা ব্যারাকে ফিরে গিয়ে আর্মি আক্রমণের অপেক্ষায় থাকলাম। পরিষ্কার দেখতে পারছিলাম, আর্মি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে চারদিক থেকে ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এভাবে দুই দিন পর তারা আমাদের ক্যাম্পের ভেতর প্রবেশ করে প্রত্যেকের লকার, বাক্সপেটরা, জামাকাপড় তল্লাশি করে দারুণভাবে হতাশ হলো। কারণ কোথাও একটি বুলেটও তারা পায়নি। পাবে কী করে? যারা বন্দুক নিয়েছিল তারা তো তা গার্ডরুমেই জমা দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া সবাই তো বন্দুক নেয়ওনি।

তখন থেকেই সমগ্র বিমানবাহিনী চলে গেলো আর্মির একটি ডিভিশনের অধীনে। নায়েক সুবেদার নূরের কমান্ডে চলে এলাম আমরা সব বিমানবাহিনীর সদস্য। শুরু হলো সকাল থেকে সন্ধ্যা মানসিক নির্যাতন। নানা ধরনের দুর্ব্যবহার। কথায় কথায় বুটের লাথি। এভাবে আরো তিন দিন গত হলো। ৫ অক্টোবর দুপুর বেলা সুবেদার নূর তার ইচ্ছেমতো নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করলো। যেমন– ইসলাম। যত ইসলাম ওখানে উপস্থিত ছিল সবাইকে একদিকে নিয়ে গেলো। এভাবে একই নামের যত বিমানসেনা আছে, তাদের সবাইকে একদিকে নিয়ে গেলো। তারপর আরো কিছু লোককে সুবেদার নূর তার ইচ্ছেমতো বের করলো। এভাবে প্রায় ১৫০-২০০ জনের একটা দলকে কয়েকটি ট্রাকে তুলে নিয়ে এলো বর্তমান সংসদ ভবনের পাশে তৎকালীন নবম ডিভিশনের সদর দপ্তরে। এখানে এনে আমাদের ছোট ছোট তিনটি কক্ষে ঠেসে দেওয়া হলো। তারপর শুরু হলো শারীরিক নির্যাতন। ওদের নির্যাতনের কৌশল ছিল অত্যন্ত নির্মম। তাদের লঙ্গরখানা থেকে দুটি করে রুটি এবং কিছু ডাল আমাদের হাতে হাতে দেওয়া হতো এবং ঐ সময়েই ওপরের জিজ্ঞাসাবাদের নামে শুরু হতো কতগুলো অসহায় বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনী সদস্যের ওপর অমানুষিক নির্যাতন। নির্যাতনের করুণ আর্তনাদে অপর সব বন্দি সৈনিকের হাত থেকে রুটি মাটিতে পড়ে যেতো। বুক ফেটে কান্না আসতো। এভাবে ১৫-২০ দিন অতিবাহিত হলো, ইতোমধ্যে অনেককে হারিয়ে ফেলেছি।

অক্টোবরের ২৫-২৬ তারিখ হবে। হঠাৎ বাইরে দেখি বিমানবাহিনীর কয়েকটি বাস দণ্ডায়মান। মনে মনে খুবই আশান্বিত হলাম। কিছুক্ষণ পর একজন আর্মি সদস্য এসে আমাদের নাম ডাকলো। আমাকেসহ প্রায় শখানেক লোককে একদিকে করে বাকিদের দরজা বন্ধ করে দিলো। কিছুক্ষণ পর তাদের কমান্ডার (যতদূর মনে পড়ে কর্নেল মুজিব)

এসে একটি লম্বা উপদেশমূলক বক্তৃতা দেন (যার মূল অর্থ : তোমরা নির্দোষ, নির্দোষ হইলে কী অইবো! অহনো সময় আছে– ভালো অইয়া যাও)। বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম। বিমানবাহিনীতে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরুর স্বপ্নও দেখলাম। কিন্তু বিধি বাম। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো নাখালপাড়া ড্রাম ফ্যাক্টরি সংলগ্ন প্রভোস্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি ইউনিটে। সেখানে সারা দিন আটকে রেখে সন্ধ্যায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

জেলে ৪ খাতায় (৪ নং ভবনের) দ্বিতীয় তলায় গিয়ে উঠলাম আর সেখানে দেখলাম শত শত বিমানসেনার ক্ষতবিক্ষত দেহ মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। বিমানবাহিনীর ফিল্ড ইউনিট জিজ্ঞাসাবাদের নামে এদের সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে দিয়েছে। তারপর এদের ৩১ নং বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার করে ফাঁসির দণ্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কর্পোরাল আজিমের শরীর পচে গন্ধ বের হয়েছে। কারাগারে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা তখন ছিল না। সে এমনিতেই মারা যায়। অথচ তার সাজা হয়েছিল ৫০ বছর কারাদণ্ড। রাত গভীর হতেই আমাদের মধ্যে আতঙ্ক বেড়ে যেতো। কারণ কারাগারের জল্লাদরা একটি তালিকা হাতে আমাদের লৌহকপাটে এসে যখন হতভাগ্যদের নাম ধরে ডাকতো তখন মনে হতো স্বয়ং আজরাইল উপস্থিত হয়েছে। এভাবে প্রতি রাতেই ২০-২৫ জন করে লোক নিয়ে যায়, আর তারা ফিরে আসে না। বুঝতে আর বাকি থাকে না যে আমারও এমনি করে একদিন ডাক আসবে। কিন্তু আমি তো আর্মি কর্তৃক বেকসুর খালাস। তবু প্রস্তুত হতে থাকি। দিবারাত্রি কেবল আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় রত শত শত অসহায় সেনা ও বিমান সদস্য। এভাবে আরো কত দিন যে গেলো মনে নেই। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর একদিন আমার ডাক এলো। তবে রাতে নয়, দিনে। কারাগার থেকে বের করে নিয়ে সেই প্রভোস্ট ইউনিটে। আমার সঙ্গে আরো প্রায় ২০-২২ জন বিমানসেনা ছিল। সেখানে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা একটি প্রকোষ্ঠে বন্দি থাকার পর আমাদের হাত আর চোখ বেঁধে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে কোনো এক অজানা স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর শুরু হলো বেদম মারধর। এভাবে কত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পারিনি। কারণ চোখের বাঁধন এত শক্ত ছিল যে প্রায় অন্ধই হয়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত পোশাক খুলে ফেলা হয়েছিল। শুধু একটি অন্তর্বাস পরা অবস্থায় হাত, পা ও চোখ বেঁধে নির্যাতন চালানো হতো অসহায় মানব সন্তানদের ওপর। নির্যাতনকারীরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নানাপ্রকার পরিহাস করতো। জানতে চাইতো ৭ নভেম্বর সম্পর্কে আমার অভিমত কী? কাল মার্কস কে ছিল? সমাজতন্ত্র কী? মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিলাম? এভাবে প্রায় পাঁচ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন এনে উপস্থিত করলো ৩১ নং বিশেষ সামরিক আদালতের বিচারক উইং কমান্ডার সদরউদ্দিন আহমদের সামনে। হাত ও চোখ বাঁধা, সমস্ত শরীর একটি চাদর জাতীয় কাপড় দিয়ে ঢাকা। বিচারক চোখ খুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে রায় ঘোষণা করলেন, তোমার শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড। আমি বললাম, এটা অন্যায়, জুলুম। আমি কোনো অপরাধ করিনি। বিচারক বললেন– তোমার কোনো সাক্ষী আছে? আমি বললাম, একমাত্র আল্লাহই আমার সাক্ষী। তিনি সব দেখেছেন। বিচারক বললেন, তবে তার বিচারের অপেক্ষায় থাকো। এই বলে

কী যেন লিখলেন এবং ১ মিনিটেই আমার জীবনের ফয়সালা করে তিনি আসন ত্যাগ করলেন। আমার কোনো কথাই তিনি শুনলেন না। তারপর আবার তড়িঘড়ি করে চোখ বেঁধে, হাতে রশি ও পায়ে দড়ি বেঁধে আরো আট-নয়জনসহ ঐ সাদা অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ গ্রুপের মধ্যে আমরা দুই জনই বেঁচে ছিলাম। আমাকে যখন বিচারকের সামনে নেওয়া হয়েছিল তখন বারবার চেষ্টা করেও আমি কোনো সুযোগ পাইনি এই কথাটা বলতে যে আমার চোখ বাঁধা অবস্থায়ই নির্যাতনকারীরা কোনো একটি কাগজে আমার স্বাক্ষর নিয়েছিল।

কারাগারে বসে মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। আমার আশপাশের সবাইকে ডেকে নিয়ে শেষ করে দিয়েছে। অবশিষ্ট শুধু আমি। যেকোনো মুহূর্তে আমারও ডাক আসতে পারে। এভাবে যখন প্রায় এক মাস গত হলো, তখন মনে একটু আশা পেলাম যে হয়তো বেঁচে যাবো। কারণ তখন জেলখানায় বহু গুজব শোনা যাচ্ছিল। যেমন, ফাঁসি বন্ধ হয়ে গেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আবেদন করেছে ইত্যাদি। যাই হোক, প্রায় তিন মাস পর সেই বিচারক সদরউদ্দিন আহমদ কারাগারের দপ্তরে স্বয়ং এসে যারা জীবিত তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা শুনিয়ে চলে গেলেন। তখন বুঝতে পারলাম আমার আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

কারাগারে ফাঁসির দড়িতে মৃত্যু অবধারিত জেনে আমি অনেকটা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মাথায় প্রতিনিয়ত প্রশ্ন জাগছিল, ২ অক্টোবর কী ঘটেছিল? সমগ্র ব্যাপারটি জানতে প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। তাই কারা প্রহরীর (মিঞা সাহেব) মাধ্যমে সংবাদ নিতে শুরু করলাম কে কোথায় আছে। জানতে পারলাম কনডেমড সেলে মৃত্যুর দিন গুনছেন সার্জেন্ট আফসার, কর্পোরাল আবু বক্কর সিদ্দিকসহ আরো অনেকে। ইতোমধ্যে কয়েকশ বিমানসেনা ও সেনাবাহিনীর সিগন্যালস ও সাপ্লাই কোরের সদস্যকে 'খালাস' করে দেওয়া হয়েছে। একদিন এক মিঞা সাহেবকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বললাম, সে যেন সার্জেন্ট আফসারের কাছ থেকে জেনে আসে যে আমাদের জন্য তার কোনো বক্তব্য আছে কিনা। পরদিন ঐ মিঞা সাহেব এসে আমাকে যা বলেছিল তা শোনার পর বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। সার্জেন্ট আফসার মিঞা সাহেবের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছে, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ, ঐ ঘটনার জন্য আমরা কেউ দায়ী নই, আমরা যেন তাকে ক্ষমা করে দিই। তখন চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সৈনিকদের যখন ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কেন তারা করুণ আর্তনাদে বলেছিল, 'আমাদের পরিবার-পরিজনকে বলবে আমরা কোনো অপরাধ করিনি, আমরা নির্দোষ।' তারপর একে একে দিন যেতে লাগলো। কারা যন্ত্রণা সইতে শিখলাম। মৃত্যু যখন প্রত্যাখ্যান করলো, নতুন করে বাঁচতে চাইলাম। এমন সময় এক সকালে শুনি জিয়াউর রহমান নিহত। আবার আতঙ্কিত হলাম। আবার না জানি কত শত মায়ের বুক খালি হয়, কত নারীকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। অবশেষে হলোও তাই। প্রেসিডেন্ট হত্যাকে এড়িয়ে সেনা বিদ্রোহের অপরাধের নামে এক ডজন উজ্জ্বল অফিসারকে অকালে প্রাণ দিতে হলো।

অন্যায়ভাবে দখলকৃত ক্ষমতাকে রক্ষার জন্য আরো অন্যায় করে যেতে হয়– এই অন্যায়ই একসময় সে ক্ষমতাধরকে নিক্ষেপ করে ইতিহাসের অতীতে।

চোখ-হাত-মুখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়
—কর্পোরাল শাহ মুনীর শরীফ

অভিশপ্ত ২ অক্টোবর, ১৯৭৭। আজও জানতে পারিনি— আসলে ঐ দিন কী ঘটেছিল, কারা ছিল নাটের গুরু, নেপথ্যের হোতা এবং কী ছিল আমার অপরাধ!

১৯৭৭ সালে আমি বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে নিয়ন্ত্রণাধীন সাজ-সরঞ্জাম ডিপোর প্রশাসনিক শাখায় একজন এনসিও হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ১ অক্টোবর বেতন পেয়ে আমি ছয় দিনের সাময়িক ছুটি মঞ্জুর করিয়ে পরদিন ২ অক্টোবর থেকে ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। বিকেলে আমার এক সহকর্মী সার্জেন্ট মালেকসহ গুলিস্তানে এসে কিছু কেনাকাটা করি। ঐ সময় আমি সাত মাসের এক কন্যাসন্তানের জনক।

রাতে বিমানসেনা মেসে খাওয়া-দাওয়ার পর দোতলায় টিভি দেখার জন্য যাই। এ সময় জাপানি এয়ারলাইন্সের বিমান হাইজ্যাকিং ঘটনাবলি তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছিল। জাপানি রেড আর্মির সঙ্গে জিম্মি বিনিময়ের দৃশ্যাবলি সবাই বেশ আগ্রহ ভরে উপভোগ করছিল। এমন সময় রাত এক বা দেড়টার দিকে কুর্মিটোলা বিমানসেনা ছাউনিতে সব বাতি কে বা কারা নিভিয়ে দেয় এবং প্রচণ্ড শব্দে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গেই কিছু আর্মির গাড়ি দেখা যায় এবং গাড়ির আরোহীরা মাইকে সব বিমানসেনাকে তাদের সঙ্গে 'বিপ্লবে' যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাতে থাকে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে না তাদের গুলি করা হবে বলে ঘোষণা দেয়। আরো নানারকম হইচই, চিৎকার ও দৌড়াদৌড়িতে কুর্মিটোলা বিমানসেনা ছাউনিতে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কী করা উচিত— এ ধরনের পরামর্শ দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। যে যার বুদ্ধি ও সুযোগমতো বিভিন্ন জায়গায় সরে পড়ার চেষ্টা করে। আর্মি গাড়ির আরোহীরা বিমানসেনাদের আবাসস্থল ব্যারাকগুলো অবরোধ করে বেশ কিছু বিমানসেনাকে তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করে।

আমি বিমানসেনা মেসের দোতলায় টিভি রুমে ছিলাম। এয়ারম্যান ব্যারাকের দিকে না গিয়ে আমরা বেশ কয়েকজন দোতলা থেকে নেমে মেসের পেছনে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আত্মগোপন করি। পরিস্থিতির আরো অবনতি হলে আমরা বর্তমান ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, যেটা সে সময় অর্ধনির্মিত জঙ্গলাকীর্ণ একটি পরিত্যক্ত বিশাল

জনমানবহীন প্রান্তর ছিল– সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। রাতের বাকি সময়টুকু ওখানেই পালিয়ে থাকি। সকালে ব্যারাকে ফিরে এসে চিন্তা করি যে ছুটিতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হব কিনা। কোনো কিছু ঠিক করতে না পেরে আমি আমার সেকশন ইনচার্জ ওয়ারেন্ট অফিসার সায়েদুল হকের কাছে যাই। তিনি আমাকে জানান, পরিস্থিতি ভালো নয়। কাজেই এ অবস্থায় স্টেশন ত্যাগ না করাই ভালো। তার পরামর্শ অনুযায়ী আমি ব্যারাকেই অবস্থান করতে থাকি। ৫ অক্টোবর আর্মি বেঙ্গল রেজিমেন্ট এসে পুরো কুর্মিটোলা বিমানসেনা ছাউনি ঘেরাও করে এবং ব্যারাকে অবস্থানরত সব বিমানসেনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। যেহেতু আমি ঘটনার সময় কোথাও যাইনি, তাই আমাকে আমার ইউনিটে যথারীতি ডিউটি প্রদান করা হয় এবং আমিও ছুটিতে না গিয়ে রীতিমতো ডিউটি করতে থাকি। আমার ইউনিটের অধিনায়ক ছিলেন উইং কমান্ডার খায়রুজ্জামান এবং অফিসার ইনচার্জ ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম এ খালেক ও ফ্লাইং অফিসার শাহজাহান। আমার এক রুমমেট কর্পোরাল গাজীউর রহমান (বাড়ি নরসিংদী, রায়পুর) জানি না কিভাবে ধরা পড়েছে– ঘটনাস্থল থেকে, নাকি অন্য কোথাও থেকে। তাকে দীর্ঘ নির্যাতন করে শুধু বলা হয়েছিল, অন্তত পাঁচ জনের নাম বলো, ছেড়ে দেবো। নির্যাতনে অচেতন অবস্থায় সে আমার আরেক রুমমেট কর্পোরাল নূরুল ইসলাম ও আমার নাম বলে। ১৯ অক্টোবর আমাদের চোখ-হাত-মুখ বেঁধে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে নির্যাতনে আহত করে। আমাদেরও বলা হয়, অন্তত পাঁচজনের নাম বলো, ছেড়ে দেবো। কিন্তু আমরা কারো নাম বলতে না পারায় অমানুষিক নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে প্রহসনমূলক সাজানো বিচারে চার বছর করে কারাদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়। অবশ্য কর্পোরাল গাজী পরে তার জবানবন্দি প্রত্যাহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে আর সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আমার বিশ্বাস, কর্পোরাল গাজী এখনো জীবিত আছেন। কাজেই সত্যাসত্য প্রমাণের সুযোগ এখনো আছে। জীবিত আছেন তথাকথিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান উইং কমান্ডার সাবের উদ্দিন এবং আরো জীবিত আছেন নির্যাতনকারী গ্রুপের অনেকে। এ ধরনের চিহ্নিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলে অনেক রহস্যের কূলকিনারা পাওয়া যেতো বলে আমার বিশ্বাস।

গণহারে সৈনিক হত্যার সঙ্গে সে সময় যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল, তাদের খুঁজে বের করলেই সব কিছু উন্মোচিত হতো। আমার সার্ভিস ফাইল নিশ্চয়ই এখনো বিমানবাহিনীতে সংরক্ষিত আছে। সেখানে খোঁজ করলেই দেখা যাবে আমার চাকরি জীবনে নিষ্কলুষ রেকর্ড। কিন্তু বিনিময়ে কী পেলাম! নির্যাতন, চাকরিচ্যুতি, শাস্তি এবং জীবনের সোনালি সময়ের অনাকাঙ্ক্ষিত অপচয়। পরবর্তীকালে জীবনসংগ্রামে এক অমানবিক কষ্টকর অভিজ্ঞতা, যা এখনো শেষ হয়নি। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, বর্তমান নৈরাশ্যজনক, অতীত এক মরীচিকা। কে দায়ী আমার এই বিড়ম্বিত জীবনের জন্য?

এক সামরিক আদালতে ছাড়া পেলেও আরেক আদালতে কারাদণ্ড —কর্পোরাল নুরুল ইসলাম

১৯৭৭ সালের ১ অক্টোবর। তখনো কর্পোরাল পদে হেলিকপ্টার এমআই-৮-এর মেইনটেনেন্স শাখায় কর্মরত ছিলাম। অক্টোবরের ৯ তারিখেই সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়ে আমার ভিন্ন ব্যারাক ও ভিন্ন মেসে চলে যাওয়ার কথা। বিকেলে বেরিয়ে চলে গেলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিলিমিনারি ক্লাসে। রাতে আর কুর্মিটোলা বালুরঘাটের সেই ১৭৬ নং ব্যারাকে ফিরলাম না। চলে গেলাম গেণ্ডারিয়ায় বোনের বাসায়। কারণ পরের দিনটি ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কিন্তু আগের রাতে সেনানিবাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিন্দুমাত্র টের পেলাম না।

পরের দিন অর্থাৎ ২ অক্টোবর সকালের নাশতা শেষে রওনা দিলাম বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে। সকাল সাড়ে নয়টায় গুলিস্তানে এসে লোকমুখে সেনানিবাসে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কথা প্রথমে শুনতে পেলাম। ঘটনার গভীরতা একেবারেই উপলব্ধি করতে না পেরে ফার্মগেট থেকে রিকশায় সেনানিবাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পুরোনো সংসদ ভবন এবং পুরোনো বিমানবন্দরের মাঝামাঝি জায়গা থেকে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো বিমানবন্দরের ভেতর। সেখানেই ক্যাপ্টেন সাদেককে বলি, 'স্যার, আমি এর কিছুই জানি না, আমি বাইরে থেকে এলাম, আমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হলো?' তিনি শুধু বললেন, 'you shut up and sit down with others'. আমাকে কোনো কথাই বলতে দিলেন না। কিছু শুনতেও চাইলেন না।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম আরো ৬০ জনের মতো বিভিন্ন র‍্যাংকের বিমানসেনা। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। সারা দিন না খাইয়ে রেখে বেলা আনুমানিক ৪টায় আমাদের পরনের কাপড়চোপড়, ইউনিফরম, হাতঘড়ি, মানিব্যাগ সবই নিয়ে নেওয়া হয় তদানীন্তন মেজর একরামের নির্দেশে। আমাদের পরনে আন্ডারঅয়্যার ছাড়া কিছুই ছিল না। আমার পাশে একজন ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, 'কী হবে আমাদের?' আমি শুধু আওড়ালাম 'maximum firing squad'.

সন্ধ্যায় প্রিজন ভ্যানে করে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো নাজিম উদ্দিন রোডের কেন্দ্রীয় কারাগারে। সংখ্যায় আমরা সম্ভবত ৬৫ জন ছিলাম (এদিকে বাইরে কুর্মিটোলায় বা বালুরঘাটে কী হলো কিছুই জানলাম না)। ৫ তারিখ থেকে ১০ জন করে প্রতিদিনই নিয়ে যাওয়া হতে লাগলো ইন্টারোগেশনের নামে টর্চার সেলে। যে একবার যেতো তার আর

দেখা পেতাম না। আমার সঙ্গের দলটিকে চোখ, হাত-পা-কোমর বেঁধে ১০ অক্টোবর কারাগার থেকে অন্যত্র নিয়ে একটা ছোট্ট বন্ধ কামরায় রাখা হলো। অনেক পরে আমরা জেনেছি সেটি ছিল শেরে বাংলা নগরের এমপি হোস্টেল। ১২ তারিখে একজন-একজন করে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলো। কোনো ডিফেন্ডিং অফিসার দেওয়া হয়নি। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ ছিল না। আমাদের ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন মেজর খালেক। ঐ কোর্টের অন্যান্য মেম্বার ছিলেন ক্যাপ্টেন সাদেক ও দু-তিনজন সুবেদার পদমর্যাদার এনসিও। ঐ প্রহসনের ট্রাইব্যুনালে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়ে ছাড়া পাই। পরকর্তীকালে জেনেছি যে ঐ ৬৫ জনের মধ্য থেকে আমরা পাঁচ-ছয়জন মাত্র বেঁচে আছি। বাকি সবাইকে কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ডিউটি পালনরত অবস্থায় বিমানবন্দরে ধরা পড়ে এবং এরা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। বিমানবন্দর অপারেশনে আর্মির যে ইউনিট কাজ করছিল সেটা ছিল ২৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সম্ভবত ১৭ অক্টোবর আমাকে বালুরঘাটে আমার ব্যারাকে দিয়ে এলো ঐ ২৯ বেঙ্গল।

১৯ তারিখেই আবার এয়ার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট হাত-চোখ বেঁধে টর্চার সেলে নিয়ে গেলো। সারা রাত চললো অকথ্য নির্যাতন। রাতভর শুধু শুনলাম পিটুনির শব্দ, আর্তচিৎকার ও গোঙানির আওয়াজ। সবার কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় এবং না দেখে তাতে সই আদায় করে নেওয়া। কারণ বাঁধা চোখ এক মুহূর্তের জন্যও খোলার উপায় ছিল না। পরের দিন আবার চোখ বাঁধা অবস্থায় উইং কমান্ডার সাবের উদ্দিনের কোর্টে হাজির। তখনো বুঝতে পারিনি আমার একই বিচার দ্বিতীয়বার কী করে হতে পারে। পরবর্তী সময় জেনেছি, স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে অন্য একজনকে আমার নাম বলতে বাধ্য করা হয়েছিল টর্চার করে। যে কর্পোরাল গাজী আমার নাম বলেছিল, সে জেনেছিল আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে ওখান থেকে প্রাণে বেঁচে যাই। গাজী তো আমাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে এবং না জেনে নাম বলার জন্য আল্লাহর কাছে এবং আমার কাছে মাফ চাইতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণ সব শেষ। ট্রাইব্যুনাল অসহায়ত্ব প্রকাশ করে কিন্তু তার পরও আমাকে চার বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। চলে এলাম, আবারও কেন্দ্রীয় কারাগারে ৪ নং খাতায়। তখন প্রতিরাতেই চলছে ফাঁসির পালা, জোড়ায় জোড়ায় ফাঁসি। প্রতি রাতই যেন ভয়ার্ত বিভীষিকাময় আর্তচিৎকারের পালা। কখন কার ডাক আসবে ফাঁসির কাষ্ঠে যাওয়ার, কেউ জানে না। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। মুখে শুধু আল্লাহর নাম। সত্যিকারের কতজনের ফাঁসি দেওয়া হয় তা শুধু চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর জিয়াউর রহমান বলতে পারতেন!

ঐ পৈশাচিক ঘটনার দুটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটিও করা হয়েছিল। কিন্তু তা আজও আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

বিমানবাহিনী প্রধানকে বাঁচানোর বিনিময়ে চার বছরের জেল —কর্পোরাল মো. রুহুল আমিন

১৯৭৭ সালের ১ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে শুরু করে পরের দিন (২ অক্টোবর) সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত তৎকালীন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে 'এস্কট ডিউটি'তে ছিলাম। আমরা যখন তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে জাপানি বিমান ছিনতাইকারীদের নিয়ে ব্যস্ত, তখন রাত প্রায় একটা কিংবা দেড়টার দিকে কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটির গার্ডরুম থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরের টাওয়ার কন্ট্রোলরুমে টেলিফোন আসে যে একদল অপরিচিত অস্ত্রধারী লোক গোলাগুলি করে, মাইকিং করে, ঘুমন্ত বিমানসেনাদের জাগিয়ে তোলে এবং ব্যারাকে ঢুকে জোর করে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। এই পরিস্থিতিতে বিমানসেনারা কী করবে তা মনস্থির করতে না পেরে বিমানবাহিনী প্রধানের পরামর্শ ও নির্দেশ চায়।

বিমানবাহিনী প্রধান এ জি মাহমুদ সাহেবকে এ সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়। সবাই তখন তার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। বিমানসেনাদের টেনশন বাড়তেই থাকে। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বারবার টাওয়ার কন্ট্রোল রুম ও অফিসার্স মেসে ফোন করতেই থাকে। কিন্তু কোনো লাভ হয় না। এহেন পরিস্থিতিতে বিমানসেনারা কমান্ডারবিহীন, পথপ্রদর্শকবিহীন, নিরাপত্তাহীন, অরক্ষিতভাবে বহিরাগত আক্রমণকারীদের ফাঁদে জড়িয়ে গেলো। সু-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশের সম্পদ ১১ জন অফিসারসহ শত শত বিমানসেনাকে অকালে ঝরে যেতে হলো। একটি শক্তিশালী বিমানবাহিনীকে পঙ্গু হয়ে যেতে হলো।

সেদিন যারা বিচারকের আসনে বসে অসহায় সৈনিকদের সঙ্গে তামাশা করছিলেন, তাদের খুঁজে বের করা হোক এবং আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সত্য উদ্ঘাটন করা হোক।

২ অক্টোবর রাত কেটে গিয়ে ভোর হলো। থমথমে পরিবেশ। বিমান ছিনতাই ঘটনার অবসান হওয়ায় ভোর হতে না হতেই সাধারণ লোকজন সব চলে যায়। অল্পসংখ্যক বিমানবাহিনী সদস্য ও বন্দর কর্তৃপক্ষ টাওয়ার বিল্ডিংয়ে উপস্থিত ছিল। সকাল ৬-১০ মিনিটে টাওয়ার বিল্ডিংয়ের উত্তর দিকে হ্যাঙ্গারের সামনে চার-পাঁচজন ইউনিফরম পরিহিত লোককে একদল আক্রমণকারী লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে মেরে

ফেলে। এ দৃশ্য দেখামাত্র দৌড়ে এ জি মাহমুদ সাহেবের কামরায় গিয়ে তাকে সব বলি। (পরে জানতে পারি যে যাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয় তারা সবাই বিমানবাহিনীর অফিসার ছিলেন)। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবাহিনীর অফিসাররা যারা ঐ বিল্ডিংয়ে ছিলেন তারা যে যেখানে নিরাপদ মনে করেছেন সেখানেই লুকিয়ে পড়েন। আমি, প্রভোস্ট কর্পোরাল সাইফুল আমিন, এ জি মাহমুদ সাহেব এবং সিভিল এভিয়েশনের জনৈক কর্মকর্তা– এই চারজন মিলে ওপরেই এক রুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখি। রুমের ভেতরে একটি বড় স্টিলের আলমিরা ছিল। ওটাকে টেনে একদিকে ফাঁকা করে সেই আড়ালে এ জি মাহমুদ সাহেব এবং সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তাকে রেখে মো. সাইফুল আমিন ও আমি রুমের দরজার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার কাছে ছয়টি গুলি ভর্তি একটি রিভলবার ও মো. সাইফুল আমিনের কাছে একটি ম্যাগাজিন ভর্তি গুলিসহ একটি স্টেনগান ছিল। আমরা মনস্থির করে ফেলি, দরজা ভেঙে কেউ ভেতরে ঢুকতে চাইলে আমরা ফায়ার ওপেন করবো। তারপর যা হওয়ার তাই হবে।

ততক্ষণে থেমে থেমে গুলির শব্দ ও সেই হইচই ও আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। যতই সময় যেতে থাকে গুলির শব্দ ও হইচই ততই স্পষ্টতর হতে থাকে। মাঝেমধ্যে আমাদের চারজনের মধ্যে করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। একপর্যায়ে সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তা আমাদের উদ্দেশে বলেন, আক্রমণকারীরা দরজা ভেঙে ঢুকলেও আপনারা কোনো গুলি করবেন না। তা করতে গেলে ওরা ব্রাশ করে সবাইকে এক সঙ্গে মেরে ফেলবে। উক্ত কর্মকর্তার কথা শুনে এ জি মাহমুদের দিকে তাকালে উনি বলেন, হ্যাঁ, তাই করুন এবং আপনারা আল্লাহকে ডাকুন, উনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতেও পারেন। সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তাটি আবার বললেন, 'এখন এই একটি কাজ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।' আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আল্লাহকে ডাকতে থাকি। একপর্যায়ে মো. সাইফুল আমিন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকেন তিনি। এমনিভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। ওদিকে আক্রমণকারীরা আমাদের রুমের প্রথম দরজার সামনে এসে হাজির হয়ে চিৎকার করে দরজা খুলতে বললে মো. সাইফুল আমিন হঠাৎ করে স্টেনগান হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ান এবং জানালা খুলে লাফিয়ে নিচে নেমে পড়েন। রয়ে গেলাম আমরা তিনজন। মৃত্যু অবধারিত জেনেও এ জি মাহমুদ সাহেবকে একা ফেলে রেখে পালাতে পারলাম না। একবার ভেবে নিলাম, যদি মরতে হয় একসঙ্গে মরবো। যদি বাঁচি একসঙ্গে বাঁচবো।

ওরা (আক্রমণকারীরা) দ্বিতীয় দরজা ভেঙে গালাগাল করতে করতে রুমের ভেতর ঢুকেই চিৎকার করতে লাগলো, কোথায় এ জি মাহমুদ... কোথায় এ জি মাহমুদ। একপর্যায়ে স্টিলের আলমিরার আড়ালে থেকে দুজনকে বের করে অস্ত্রের মুখে আমাদের তিনজনকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নিয়ে যায়। এ জি মাহমুদ সাহেব ওদের বারবার বলতে থাকেন, তোমরা

আমার কথা শোনো... আমার কথা শোনো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তার কোনো কথাই তারা শুনতে নারাজ।

আক্রমণকারীর মধ্যে আমি একজনকে চিনতে পেরেছিলাম। আমি সুযোগ খুঁজছিলাম তার সঙ্গে আলাপ করতে, একটা শেষ চেষ্টা মাত্র। আক্রমণকারীরা এ জি মাহমুদকে মারার আগে নিজেদের মধ্যে কিছু শলাপরামর্শ করতে একত্র হয়। এ সুযোগে ওদের নেতা সার্জেন্ট আফসারকে দুহাত ধরে অনুরোধ করে বলি, আফসার ভাই, দয়া করে আমাদের চিফ অব স্টাফকে মারবেন না। তাকে মারলে এই মুহূর্তে এয়ারফোর্সকে কমান্ড করবে কে? সার্জেন্ট আফসার এবং তার দলের অন্যদের সঙ্গে অনেক যুক্তিতর্কের পর আমার প্রস্তাবে রাজি হয় তারা। আল্লাহর অশেষ রহমতে ওয়ারেন্ট অফিসার রহমান, জনৈক সার্জেন্ট ও কর্পোরাল (সম্ভবত ওরা জিসি উইং-এর হবে) এসে আমার পক্ষে যোগ দেয়। তারাও এ জি মাহমুদকে না মারার পক্ষে বক্তব্য দেয়। তখন সার্জেন্ট আফসার বলেন, 'যান আপনাকে ছেড়ে দিলাম। কাল যে আপনি আমাকে 'হ্যাং' করবেন তা আমি জানি।' আমাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এরা যদি এত অনুরোধ না করতো তাহলে আপনাকে রেহাই দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

এরপর সার্জেন্ট আফসার তার সঙ্গীদের নিয়ে বিমানবন্দর ছেড়ে চলে যায়। ওরা চলে গেলে এ জি মাহমুদকে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায় এ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। এ জি মাহমুদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, আপনি কোথায় যাবেন? উত্তরে তিনি বললেন, দেখো, এই মুহূর্তে আমার এয়ার হাউস অথবা নিজের বাড়ি কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয়। বরং আমি তোমাদের কারো বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। তার ইচ্ছেমতো লোক খুঁজে পাওয়া গেলো। একজন বললো, আমার বাসা ফার্মগেটে। পরিস্থিতি শান্ত হলে আমি আপনাকে আমার বাসায় নিয়ে যাবো। সে এ জি মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে থেকে গেলো। তাদের দুজনকে নিচতলায় একটি নির্দিষ্ট কামরায় রেখে বাইরের দিক থেকে তালা লাগিয়ে রাখা হবে। বাইরে একজনের কাছে চাবি থাকবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সে তালা খুলে দেবে এবং তারা বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবেন।

এতখানি নিশ্চিত হওয়ার পরই আমি বিমানবন্দর ত্যাগ করি। তারপর কী ঘটে তা আমি জানি না। বিমানবন্দর ত্যাগের পর আমি কুর্মিটোলায় আমার ইউনিটে যাই। ইউনিটে গার্ডরুমে আমার গুলিসহ রিভলবারটি জমা দিই।

তারপর এক দিন অফ ডের পর ৪ থেকে ১৩ অক্টোবর '৭৭ পর্যন্ত আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বুকটান করে ডিউটি করতে থাকি। এ জি মাহমুদ সাহেব আমাদের অভয় দিয়ে বলেন, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে, ও নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না। এখন মন দিয়ে ডিউটি করে যান।' লজ্জা বা সংকোচ আমার ছিল না। যারা তাকে ফেলে চলে গিয়েছিল তাদের লজ্জা হওয়ার কথা।

আমি তো ভেবেছিলাম, আমার নিষ্ঠার সঙ্গে ডিউটি করার জন্য চিফ অব স্টাফ আমাকে যেকোনো একটি রিওয়ার্ড দেবেন। আক্রমণকারীদের হাত থেকে তাকে যেভাবে কৌশলে বাঁচিয়েছি, তাতে এ জি মাহমুদ সাহেবের ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

১৪ অক্টোবর আমাকে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হলো। আমি শাহীন অডিটরিয়ামে গেলাম। আমাকে অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন করা হলো। আপনি ফায়ার ওপেন করলেন না কেন? উত্তরে বললাম, ফায়ার ওপেনের বিষয়ে নিষেধ ছিল। আর তা করলে আমাদের সবাইকে এলএমজি দিয়ে ব্রাশফায়ার করে তুলোর মতো উড়িয়ে দিতো।

কী অবিশ্বাস্য ঘটনা। আমি বন্দি হলাম। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল। সত্য পথে চলার এই কি প্রতিদান। ভাবলাম, আদালতে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হবে না। আমি অবশ্যই ছাড়া পেয়ে যাবো। আমার ১ নং সাক্ষী তো চিফ অব স্টাফ নিজেই। অতএব আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবে কে?

২০ বছর আগে তথাকথিত মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম, আমার বিশ্বাস আমার সেদিনের বক্তব্য আর আজকের মূল বক্তব্যের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য হবে না। সরকার ইচ্ছে করলে মিলিয়ে দেখতে পারে।

আমি আজও হিসাব মেলাতে পারছি না। আমাকে কোন দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। যারা কর্তব্য কাজে অবহেলা করে পালিয়ে গেলো তারা বেঁচে গেলো, আর আমি আমার কর্তব্য কাজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, সত্যকে সত্য বলে ফেঁসে গেলাম। মিথ্যা মামলায় আমাকে জড়িয়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ওদের কী লাভ হলো? আমার বেলায় কেন এমন হলো? কে দেবে আমার এসব প্রশ্নের জবাব?

*২ অক্টোবর '৭৭-এর অভ্যুত্থানে দৃশ্যত
সার্জেন্ট আফসার ও তার অনুগত বা
সমর্থক দলবল কিংবা জোরপূর্বক বাধ্য
করা আরো কয়েকজন অথবা তর্কের
খাতিরে আকবর, শরীফ, রুহুল,
আনোয়ার ও নূরুল ইসলামরা যদি
একটা পক্ষ হয়ে থাকেন, তবে তার
বিপক্ষ হবেন জিয়াউর রহমান, এ জি
মাহমুদ, মীর শওকত আলী প্রমুখ।
এখানে তারা ছিলেন রাষ্ট্র বা সরকার
পক্ষ অথবা আরো ভেঙে বললে এতে
জড়িয়েছিলেন সেনা বা বিমানবাহিনীর
পক্ষ হয়ে।*

*আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হবে জাসদ,
গণবাহিনী বা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা যাই-ই
বলি না কেন, তাদের একজন
হাসানুল হক ইনু। আরেক দৃষ্টিতে যে
ঘটনাকে উপলক্ষ করে বা সামনে রেখে
অপ্রস্তুত অবস্থায় সুযোগ নিয়ে ঐ
অভ্যুত্থান ঘটে, সেই জাপানি বিমান
ছিনতাই ঘটনার সময় উপস্থিত থেকে
প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ইতিহাসের পাতায়
ঠাঁই নিয়েছেন জাপানি মন্ত্রী হাজিমি
ইশি। এই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে যার যার
প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে
পাওয়া গেছে এ রকম বর্ণনা।*

হাজিমি ইশি

১৯৭৭ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর জাপান এয়ারলাইন্সের বিমানটি যখন ছিনতাই হয় তখন হাজিমি ইশি ছিলেন জাপানের ট্রান্সপোর্ট ও সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকিও ফুকুদা ছিনতাই সংকট অবসানে আলাপ-আলোচনা করার জন্য তাঁকে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় পাঠান।

তেজগাঁও বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে বিমান ছিনতাই ঘটনার অবসানে তিনি এবং তৎকালীন বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এ জি মাহমুদ গেরিলাদের সঙ্গে বেতারে সমঝোতা আলোচনা চালিয়েছিলেন। বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে আলোচনাকালে তিনি সে সময়ে বিমানবন্দরে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ দেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে।

দেখি আমার চারপাশে রক্তের বন্যা

জাপানের প্রধানমন্ত্রী তাকিও ফুকুদার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে শতাধিক সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে ১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১টায় ঢাকা পৌঁছেছিলেন হাজিমি ইশি।

তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, রাত ১২টার দিকে হঠাৎ করে বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের চারপাশে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়। তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিছু লোক কন্ট্রোল টাওয়ারের ভেতরে ঢুকেও গুলিবর্ষণ শুরু করে। তিনি এ সময় হাত তুলে 'উই আর জাপানি' বলে চিৎকার শুরু করেন। কারণ কন্ট্রোল টাওয়ারে তখন অসংখ্য জাপানি নাগরিক অবস্থান করছিল। তিনি এবং বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনার সমঝোতা প্রচেষ্টায় থাকা বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ আত্মরক্ষায় একপর্যায়ে ফ্লোরে শুয়ে পড়েন।

তিনি বলেন, 'ভোর রাতে গোলাগুলি থেমে যাওয়ার পর উঠে দেখি আমার চারপাশে রক্তের বন্যা। আলোচনায় আমাদের সহযোগিতাকারী বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন রাস মাসুদ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন আনসারীর গুলিবিদ্ধ লাশ আমার পাশেই পড়ে থাকে। সেই ছোপ ছোপ রক্তের ওপর দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটেই আমি আর ঢাকায় জাপানের

রাষ্ট্রদূত ইচিরো ইওশিওকা কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে নেমে আসি। নিচে নেমে দেখি কন্ট্রোল টাওয়ারের চারপাশও রক্তে ভেসে গেছে। বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় ৫০টি লাশ পড়ে আছে। অধিকাংশ বিমানবাহিনীর সদস্যের। সেনাবাহিনী সদস্যদের কিছু লাশও পড়েছিল। পরে শুনেছি এই অভ্যুত্থানে সেনা ও বিমানবাহিনীর ২০০ সৈন্য নিহত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে অনেক লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া পরে সামরিক আদালতে বিচার করে আরো অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।'

তেজগাঁও বিমানবন্দরে অস্ত্র হাতে সৈনিকরা

মীর শওকত আলী

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের ঐ অভ্যুত্থান দমন করার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন নবম ডিভিশনের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী। ব্যাপক রক্তক্ষয় ঘটলেও অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ঐ বিদ্রোহ দমন করা হয়। অভ্যুত্থানকালীন ও পরবর্তী ঘটনাবলি নিয়ে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, বিদ্রোহীদের দেখামাত্র গুলি করে হত্যার নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন।

২০০৭ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল শওকতের সঙ্গে তার গুলশানের বাড়িতে '৭৭-এর অভ্যুত্থান নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। অভ্যুত্থানের পূর্বাপর বিস্তারিত তিনি জানান। জেনারেল শওকতের কাছে জানতে চেয়েছিলাম ২ অক্টোবরের ঘটনাটি আসলেই কোনো অভ্যুত্থান ছিল কিনা। কারণ অনেক সেনা কর্মকর্তাই আমাকে বলেছেন, সেদিন আসলে জেনারেল জিয়া পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র বাহিনীতে তার শত্রুদের চিহ্নিত করে 'শেষ' করে দেওয়ার ফাঁদ পেতেছিলেন। সামরিক গোয়েন্দাদের দিয়ে অভ্যুত্থানের এই ফাঁদ পাতার খবর কতটা সত্যি তা নিয়ে জেনারেল শওকত কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তার কাছেও বিষয়টি রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে। তিনি জানান, জেনারেল জিয়াউর রহমান অক্টোবরের বিদ্রোহের আগাম খবর পেয়েছিলেন মিসরের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের কাছ থেকে। ১৯৭৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তিন দিনের সফরে জেনারেল জিয়া মিসর যান। ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনী দিবসে তার প্রধান অতিথি থাকার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তিনি উপস্থিত থাকবেন না বলে জানিয়ে দেন। ২৮ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনী দিবসে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জিয়াসহ সব সিনিয়র অফিসারকে হত্যা করা হবে বলে আনোয়ার সাদাত তাঁর নিজস্ব গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। জেনারেল শওকত জানান, এই তথ্যটি দিয়ে আনোয়ার সাদাত জিয়াকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তিনি জানান, অভ্যুত্থান দমনে রেডিও স্টেশন, বিমানবন্দর, জিয়ার বাসভবনের আশপাশে এবং ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন গেটে সৈনিকদের প্রাণহানি ঘটেছে। তার ধারণা এই সংখ্যা এক শর বেশি না। পরবর্তী সময়ে বিচারের মাধ্যমে ১১৩০ জনের মৃত্যুর খবর তিনি শুনেছেন, তবে নিশ্চিত নন বলে জানান।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী গ্রেপ্তার ও বিচারের বিয়য়ে জেনারেল শওকত জানান, নবম ডিভিশন রেডিও স্টেশন থেকে প্রায় ৪০ ও বিমানবন্দর থেকে ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাকিদের কারা গ্রেপ্তার করেছে এবং কী প্রক্রিয়ায় বিচার হয়েছে তা নিয়ে তিনি মুখ খুলতে চাননি।

সামরিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে গণফাঁসির ব্যাপারে তৎকালীন সিনিয়র অফিসারদের ভূমিকা কেমন ছিল– এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, 'তখন সৈনিকরা অফিসারদের হত্যা করছিল বলে তারা সিনিয়রদের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি পাননি।'

আপনিই বা কেন এত নির্মম হয়েছিলেন? জবাবে জেনারেল শওকত বলেন, 'বিদ্রোহী বা দুষ্কৃতকারীদের যেকোনো উপায়ে ঠাণ্ডা মাথায় দমন করাই একজন প্রকৃত সৈনিকের কাজ।'

মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হয়ে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। রাজনীতিতে জড়িয়ে যোগ দেন বিএনপিতে। পরে বিএনপি ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সঙ্গে। তার ভাষায় বিদ্রোহ দমনের বর্ণনা।

শুট, শুট টু কিল

১ অক্টোবর। মধ্যরাত নাগাদ রাতের খাবার খেয়ে আমি আমার স্টাডিরুমে টেলিভিশনে প্লেন ছিনতাই ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার দেখছিলাম। ছিনতাই করা প্লেন, রানওয়ে এবং আশপাশের ভবনগুলোই ঘুরেফিরে দেখতে দেখতে ঘুম পাচ্ছিল। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই লাল টেলিফোনটি বেজে উঠলো। রিসিভার তুললাম। অন্য প্রান্তে চিফ অব স্টাফ জিয়া। জিজ্ঞেস করলেন, 'মীর, তুমি কি গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছো?'

জানালাম, 'আমি এয়ারকন্ডিশন্ড রুমে, স্যার। বাইরে কোনো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। আপনি একটু ধরুন, আমি চেক করে আসছি।'

বারান্দায় গিয়ে আমাকে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না। দূরে কোথাও গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো এলএমজি। গার্ডকে জিজ্ঞেস করলে সেও নিশ্চিত করলো থেমে থেমে গুলির আওয়াজ। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে জিয়াকে নিশ্চিত করলাম গুলির খবর।

'তোমার কী মনে হয়... কী ব্যাপার?'

আমি বললাম, 'আমি ধারণা করতে পারছি না। ব্যাপারটা নিশ্চিত নই।' আমি তাকে বললাম, আমার হেডকোয়ার্টারে যাওয়াটাই ভালো হবে। আমি ওখান থেকে তাকে সব কনফার্ম করবো। ফোন রেখে দেওয়ার আগেও বললাম যে আমি তার গার্ডকে আমার বাসার এবং জেনারেল ইসলাম সাহেবের বাসার গার্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি নিরাপত্তা-বলয় তৈরি করতে বলে দেবো। আইডিয়াটা তার পছন্দ হলো।

রিসিভার রাখা মাত্রই আবার বেজে উঠলো। এবার আমার জিএসও-১ লে. কর্নেল আনাম। সে ক্যান্টনমেন্টের গুলির খবর জানাতে ফোন করেছে।

আমি তাকে সব অফিসারকে ডেকে স্ট্যান্ডিং অর্ডার মাফিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদেশ দিতে বললাম।

আমার স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলে ব্যাপারটি অবহিত করে হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। একটি জিপে ওঠার পরপরই সেটি একটি ট্রাকের পেছন পেছন যেতে লাগলো। সব সময় উল্টোটা হয়, এসকর্ট ট্রাক থাকে পেছনে।

কোনোরকম ঘটনা ছাড়াই আমরা মেইন গেটের এমপি চেকপোস্ট অতিক্রম করলাম এবং ফার্মগেট হয়ে শেরে বাংলা নগরে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছালাম।

হেডকোয়ার্টারের সব লাইট জ্বালানো এবং রক্ষীরা তাদের এলার্ট পোস্টে ডিউটি করছে। জিএসও-১ আমাকে রিসিভ করলো। আমি আমার অফিসে ঢুকে সব অফিসারকে সেখানে ডাকলাম। জিএসও-১ পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জানালো। এরপর থেকে আমি পুরো অপারেশনের দায়িত্ব নিলাম। ঘড়িতে তখন রাত প্রায় ২টা।

অনেক পরে আমি শুনতে পেলাম ভাগ্যগুণে আমি একটুর জন্য মেইন গেটে বিদ্রোহীদের দ্বারা আটকে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছি। এর কারণ এমপি গেটে ওরা ভাবতেই পারেনি ট্রাকের পেছনে আমার জিপ থাকবে। ওরা যখন ভুল বুঝতে পারলো ততক্ষণে আমি গেট পার হয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি।

আমি যা বুঝলাম তা হলো, রাত আনুমানিক ১টার দিকে প্রথম গুলির আওয়াজ শোনা যায় ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল রেজিমেন্টের দিক থেকে। ওদিকে মেজর মঞ্জুর তার ডিভিশনের ফিল্ড গোয়েন্দা ইউনিটের কাছ থেকে খবর পান রাত দেড়টা নাগাদ। তিনি তখনই জিএসও-১কে ফোনে জানালে জিএসও-১ সব অফিসারকে ফোন করে তাদের নিজ নিজ অফিসে রিপোর্ট করতে বলে। মূলত এর পরই জিএসও-১ আমার সঙ্গে কথা বলে, জিয়ার সঙ্গে আমার কথোপকথনের একটু পরই।

২টার মধ্যেই সব অফিসার অফিসে পৌঁছে যায় এবং সবাই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। এমনকি তাদের জিওসি উপস্থিত না থাকলেও। আমি অনেকটা গর্ববোধ করি তাদের দ্রুত কার্যকলাপ দেখে। কারণ এদের আমি নিজেই গড়ে তুলেছি... ট্রেনিং দিয়েছি।

অফিসাররা তাদের ইউনিটগুলোকে করণীয় সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলো এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলার আদেশ দিয়ে বললো, অপরিচিত কেউ যেন অনুপ্রবেশ করতে না পারে। কোনো অনুপ্রবেশকারীকে প্রয়োজনে গুলির আদেশ ওরা পেয়েছিল আমার কাছ থেকে।

আমি আমার হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে জিয়াকে আমার লোকেশন রিপোর্ট দিয়েছিলাম। এখন যেহেতু নবম পদাতিক বাহিনীতে সব প্রস্তুতি শেষ, তাই ভাবলাম তাকে ফোন করে সব জানাই। তিনি ইতোমধ্যে অন্যান্য সোর্স থেকে মোটামুটি সব খবর পেয়েই গিয়েছিলেন কোথায় কী হচ্ছে। আমি তাকে জানালাম, নবম পদাতিক ডিভিশনে কোনো সমস্যা নেই এবং এটি যেকোনো আদেশের জন্য প্রস্তুত। জিয়া আমাকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়ে বললেন, তিনিও কিছু অস্ত্র ইউনিটে গুলির খবর পেয়েছেন, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি পরিষ্কার নন। তিনি যখন বললেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে কোনো গুলির খবর পাননি, তখন আমি তাকে বললাম, ঢাকা ব্রিগেডের তিনটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট আছে তার এলাকায় এবং তিনি প্রয়োজনে তাদের ডাকতে পারেন সরাসরি।

আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। শুধু জানা গেলো ক্যান্টনমেন্টের ভেতর একটা বিদ্রোহ চলছে, যাতে কিনা আর্মি সিগন্যাল রেজিমেন্ট, এমপি ইউনিট, এএসসি সেন্টার এবং স্কুল ও লগ এরিয়া কমান্ড এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারের কিছু ছোট ইউনিটের অন্য

তেজগাঁও বিমানবন্দরে অভ্যুত্থানে নিহত সৈনিকদের লাশ এভাবেই পড়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ
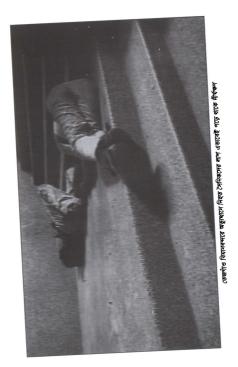
লোকজন জড়িত। সমস্যা হলো এসব আউটফিটের সবাই বিদ্রোহে জড়িত ছিল না। কিছু কিছু ছিল। এসব তথাকথিত বিদ্রোহী অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে ফেলে এবং ক্যান্টনমেন্টের ভেতর তাদের নিজস্ব ইউনিটগুলো থেকে আনা গাড়িতে করে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। ওরা বিনা কারণে আকাশের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে।

এরপর তারা বালুরঘাট এয়ারফোর্স কমপ্লেক্সের দিকে গিয়ে ওখানকার লোকজনকে বিদ্রোহে শামিল হতে উসকানি দিতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত এয়ারফোর্স মেসের লোকজন তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা গাড়ির একটি বহর নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্ডন্যান্স ডিপোর দিকে যায় এবং পরে ক্যান্টনমেন্টের মূল রাস্তা দিয়ে শহরের দিকে রওনা দেয়। আমি আরো খবর পেলাম, ওরা যাওয়ার সময় অন্যদের বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার উসকানি দেয়। কিন্তু আমরা বিমানবাহিনীকে সময়মতো আদেশ দেওয়ার ফলে এবং পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে ব্রিফ করে রাখার ফলে তাদের টলানো যায়নি।

এদিকে আমি অফিসে পৌঁছার পর থেকে চেষ্টা করছিলাম এই অপারেশনের জন্য দায়ী ব্রিগেড কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করার। কিন্তু তাকে অফিসে বা বাসা কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি তখন জিএসও-১কে আদেশ দিলাম ওই ব্রিগেডের ইউনিটগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে।

এদিকে সাভার ব্রিগেড কমান্ডার সামাদ তার ব্রিগেডে যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য। তখন রাত ২টা ১০ মিনিট। তাকে আমার সঙ্গে থাকতে বললাম এবং অয়্যারলেসের মাধ্যমে তার ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বললাম। ব্রিগেডিয়ার সামাদ তার ব্রিগেড কমান্ডার সাইদুল আনামের সঙ্গে কথা বললো ফোনে এবং আমিও সাইদুলকে বলে দিলাম, সামাদ আমার সঙ্গে আছে।

আর্মি হেডকোয়ার্টারের কাছে থাকায় ঢাকা ব্রিগেডে সমস্যা সব সময় লেগেই ছিল। এটা সব সময় কোনো বড় অফিসার দ্বারা প্রভাবিত হতো এবং কোনো কোনো সময় একেবারে পোষ মানা হয়ে যেতো কারো। আমি এর মধ্যে মির্জাপুরে ফোন করে ব্রিগেড কমান্ডারের সঙ্গে কথা বললাম এবং সব কিছু জানলাম। যখন সে জানতে চাইলো আমার ঢাকায় কোনো সাহায্য লাগবে কিনা, আমি তখন ব্রিগেডিয়ার মুস্তাদিরকে তার এলাকায় নজর রাখতে বলেছিলাম।

সাভার ব্রিগেডে নিরাপত্তা জোরদার করা হলো। রেডিও ট্রান্সমিশন সেন্টারে নিরাপত্তা বাড়িয়ে যাতে সব অনাকাঙ্ক্ষিত মেসেজ বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

এদিকে মির্জাপুর ব্রিগেড, যেটা কিনা টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেখানে সব কিছু ভালোই ছিল। শুধু টেলিফোন এক্সচেঞ্জ গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে এক্সচেঞ্জের সবাইকে অ্যারেস্ট করা হয়।

ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে চিফ অব স্টাফ জিয়ার বাসার নিরাপত্তায় নিয়োজিত করা হলো। অন্য দুই ব্যাটালিয়নকে বাইরে নিরাপত্তা ব্যূহতে রাখা হলো। জিয়া ৮

তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে নিহত সৈনিকদের লাশ সরিয়ে নেওয়া হয় এভাবে

ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে তার নিরাপত্তায় পেয়ে ভালোই বোধ করছিলেন। এই ব্যাটালিয়ন নিয়েই জিয়া ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

যেহেতু বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল না– কেন, কিভাবে, কারা এই বিদ্রোহ করছে, তাই আমি কিছু নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে গড়ে তোলা স্পেশাল ব্যাটালিয়নকে পুরোপুরি সজাগ থাকতে আদেশ দেওয়া হলো এবং হেডকোয়ার্টারে একজনকে পাঠাতে বলা হলো। লে. কর্নেল ইমতিয়াজকে অয়্যারলেসসহ তার কমান্ড জিপ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললাম। তিনি এলেন এক কোম্পানি বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ট্রুপস নিয়ে।

আমি আর সামাদ চা খাচ্ছিলাম অফিসে। এমন সময় জিএসও-১ খায়রুল আনাম এলো পুরো পরিস্থিতির রিপোর্ট দিতে। জানা গেলো রাত ২টার কিছু পর বিদ্রোহীরা আকাশের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এবং স্লোগান দিতে দিতে সাপোর্ট ও পরিবহন ব্যাটালিয়নের দিকে এগোচ্ছিল। তারা আমাদের ট্রুপসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল কিন্তু কমান্ডিং অফিসারের পরিষ্কার নির্দেশ ছিল ওরা ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলে গুলি করার। যা হোক ওরা ইউনিটের ভেতর ঢুকলো না, কিন্তু শাসিয়ে গেলো এর ফল ভালো হবে না।

জানা গেলো জিএসও-১ ঢাকা ব্রিগেডের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়নি। সরবরাহ ও পরিবহন ব্যাটালিয়নে সমস্যা শুরুর পর সে যখন ব্রিগেড কমান্ডারকে কিছু ট্রুপস পাঠাতে বললো, কমান্ডার তখন ট্রুপসের অভাবের অজুহাতে অনুরোধ ফিরিয়ে দেয়। একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতেই সে তা করবে। কিন্তু ততক্ষণে সেই ট্রুপসের আর প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্যা মিটে গিয়েছিল।

যা হোক বিদ্রোহীরা চলে যাওয়ার পর ব্রিগেড কমান্ডার এক প্লাটুন ট্রুপস পাঠালো সাপোর্ট ও পরিবহন ব্যাটালিয়নে এবং রিপোর্ট দিলো ওখানে কোনো বিদ্রোহী দেখা যায়নি।

আমি ধীরেসুস্থে আনামের বর্ণনা শুনলাম এবং তাকে ঢাকা রেডিও স্টেশনের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বললাম, বিদ্রোহীরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে গেছে।

রেডিও স্টেশনে ডিউটিরত অফিসারকে ইতোমধ্যে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়ে অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য বলা হলো। তাকে এও বলা হয়েছে যে স্টেশনের দিকে ঢোকার কোনো সন্দেহজনক চেষ্টা করা হলে যেন গুলি করা হয়। তাকে এও বলা হলো পরিস্থিতি যেহেতু খুব জটিল, তাকে হয় তার কমান্ডিং অফিসার নয়তো জিএসও-১ একজনের কেউ সরাসরি অর্ডার দেবে এখন থেকে।

আমাকে জিএসও-১ রিপোর্ট করলো রেডিও স্টেশনে সব কিছু ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে ডিউটি অফিসারের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।

আনুমানিক রাত আড়াইটার দিকে ইমতিয়াজকে বলা হলো মিরপুর ১০ ও ১২ নং সেকশনে চেকপোস্ট এবং রোডব্লক বসানোর জন্য, যাতে মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে আসার

চেষ্টা করলে বিদ্রোহীদের থামানো যায়। মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের গেটে মর্টার রেজিমেন্টকে বলা হলো আরেকটি রোডব্লক বসানোর জন্য। কিন্তু তা করার আগেই পাঁচ-ছয়জন বিদ্রোহী ক্যান্টনমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়ে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। কিন্তু নবম পদাতিক ডিভিশনের কাউকে প্ররোচিত করতে না পেরে ওরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। মনে হলো লগ এরিয়া এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারের কিছু ট্রুপস এসব এলোপাতাড়ি গুলি করেছে। কিন্তু নবম পদাতিক বাহিনীর কেউ তাতে যোগ দিলো না। বিদ্রোহীরা এ রকম এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে এবং স্লোগান দিতে দিতে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর ঘুরছিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তাতে হাসিল হচ্ছিল না।

এ পর্যায়ে ইমতিয়াজকে তার বিশেষ ব্যাটালিয়ন নিয়ে মানিক মিয়া এভিনিউ গোল চত্বর, আসাদ গেট, গণভবন ক্রসিং এবং ফার্মগেটে রোডব্লক তৈরি করতে আদেশ দেওয়া হলো।

আনুমানিক সাড়ে ৪টার দিকে একটি এমপি জিপের নেতৃত্বে পাঁচ-ছয়টি গাড়ির একটি বহর আকাশে গুলি করতে করতে রেডিও স্টেশনের দিকে এগোলো। রেডিও স্টেশন অতিক্রম করে চলে যাওয়ার ১৫ মিনিট পর ওরা ফিরে এলো। গেটের সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ওরা মেইন গেটে স্লোগান দিতে দিতে চার্জ করলো। গেটের সেন্ট্রিরা গেট খুললো না। ৪০ জন গার্ড যারা দায়িত্বে, তারা বিদ্রোহীদের দাবির প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলো না। কিন্তু যখন বিদ্রোহীরা বললো পুরো আর্মি বিদ্রোহ করেছে, ওরা তখন দ্বিধায় পড়ে যায়। আর এই সুযোগে বিদ্রোহীরা ভেতরে ঢুকে পড়ে। ওদের কেউ কেউ শিফট ইঞ্জিনিয়ারের রুমে ঢুকে তাকে তাদের তৈরি করা একটি বক্তব্য প্রচারের জন্য বলে। কিন্তু শিফট ইঞ্জিনিয়ার তা প্রচার করতে অস্বীকৃতি জানালে ওরা তাকে বন্দুকের মুখে ওই বক্তব্য প্রচারে বাধ্য করে।

এই সময়ে লাল ফোনে জিয়ার ফোন এলো।

'রেডিও স্টেশন কার দখলে?'

'অবশ্যই আমাদের হাতে, স্যার।'

'রেডিও শোনো', জিয়া বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন।

জিয়া তখনো টেলিফোন লাইনে। জিএসও-১ এবং জিএসও-২ আমার রুমে এলো। হাতে একটি রেডিও। আমি রেডিতে শুনলাম– 'প্রিয় দেশবাসী, দয়া করে একটু অনুগ্রহ করুন। আমাদের নেতা শিগগিরই আপনাদের উদ্দেশ্যে কথা বলবেন।'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। খায়রুল আনামের দিকে তাকালাম। ও দশ মিনিট আগেই আমাকে জানিয়েছিল রেডিও স্টেশনে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। ও নিজেও হতভম্ব।

এ সময় সামাদ তার ব্রিগেডের সঙ্গে অয়্যারলেসে কথা বলে আমাকে জানালো সাভার থেকে ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়েছে।

এদিকে জিএসও-২ আমার রুম থেকে অনবরত চেষ্টা করছিল ঢাকা রেডিও স্টেশনের ডিউটি অফিসারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে। সে যখন ডিউটি অফিসারকে পেলো তখনো ডিউটি অফিসার বলে যাচ্ছিল যে সব কিছু ঠিক আছে। আমি মঞ্জুরের কাছ থেকে ফোন নিয়ে নিজেই অফিসারের সঙ্গে কথা বললাম। বুঝলাম সে এয়ারকন্ডিশন্ড রুমে ঘুমাচ্ছিল এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। আমি তাকে স্টুডিওতে গিয়ে দেখে রিপোর্ট করতে বললাম এবং আরো বললাম যে তাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হবে। এদিকে জিয়া তখনো লাইনে থাকায় আমাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন এখানে কী চলছে। আমি তার কাছ থেকে ১৫ মিনিট সময় চেয়ে বললাম প্রয়োজনে আমার লাশের বদলে রেডিও স্টেশন পুনর্দখল করা হবে। উনি আশ্বস্ত হয়ে ফোন রেখে দিলেন।

ইমতিয়াজের স্পেশাল ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানি ট্রুপস ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে। ইমতিয়াজকে এক প্লাটুন ট্রুপস পাঠাতে বললাম রেডিও স্টেশনের দখল নিতে। ক্যাপ্টেন আবেদিনের নেতৃত্বে ওরা রওনা হলো। জিপ ও পিকআপ ওদের বাহন হওয়ায় এবং রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া একরকম না থাকায় ওরা দ্রুত রেডিও স্টেশনে পৌঁছে গেলো। যেতে যেতে আবেদিন তার কমান্ডিং অফিসারকে প্রোগ্রেস রিপোর্ট দিচ্ছিল এবং আমি আর সামাদ ওদের দুজনের কথোপকথন শুনছিলাম। একপর্যায়ে আবেদিনকে বলতে শুনলাম, 'আমরা রেডিও স্টেশন দেখতে পাচ্ছি।'

একটু পর সে বললো, 'আমি কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে দেখতে পাচ্ছি।' ইমতিয়াজ আমার দিকে তাকালো আদেশের জন্য।

'শুট, শুট টু কিল'– আমি বললাম।

'শুট, শুট টু কিল'– ইমতিয়াজ আবেদিনকে রিপিট করলো আমার আদেশ।

'ফায়ার', অয়্যারলেস অন থাকায় আমরা আবেদিনের আদেশ শুনতে পেলাম সবাই। মুহূর্তের মধ্যে একটি অটোমেটিক থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আবেদিন আবার অয়্যারলেসে এলো এবং বললো, 'দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যাচ্ছে।'

ইমজিয়াজ আবার আমার দিকে তাকালো। কিন্তু এবার আর কিছু বললাম না। দেখতে চাচ্ছিলাম ও নিজে কী সিদ্ধান্ত নেয়। একমুহূর্ত বিরতি নিয়ে ইমতিয়াজ বললো, 'ওদের যেতে দাও... রেডিও স্টেশন দখল করো এবং আমাকে রিপোর্ট করো।'

সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। আমার আদেশেও ছিল রেডিও স্টেশন দখলের। হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজন ছিল না। অপারেশন মোটামুটি সফল বুঝতে পেরে আমি সামাদকে বললাম, 'চলো চা খাই।'

আমার অফিসে ঢুকতেই আমার সিভিল ফোনটি বেজে উঠলো। রিসিভার তুললাম। অন্যপ্রান্তে আবেদিন।

'স্যার, আমি স্টুডিওতে, এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল।'

এ সময় ইমতিয়াজ আমার রুমে ঢুকলো একই জিনিস রিপোর্ট করতে। আবেদিন তখনো লাইনে। ওকে বললাম, 'গুড শো অ্যান্ড ওয়েল ডান। এবার তোমার কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলো।'

ইমতিয়াজকে বলে দিলাম ওকে রেডিও স্টেশনের নিরাপত্তার ভার নিয়ে নিতে। আলাপ শেষে ইমতিয়াজ জানালো, তিনজন দুষ্কৃতকারী স্টুডিওতে ধরা পড়েছে এবং ওদের হেডকোয়ার্টারে আনা হচ্ছে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। জিয়ার সঙ্গে শেষ কথা বলার পর মাত্র ১২ মিনিট পার হয়েছে। জিয়াকে ফোন করলাম। শান্তভাবে বললাম, 'স্যার, রেডিও স্টেশন আমাদের দখলে, আপনি কিছু বলবেন?'

উনি একই রকম শান্ত গলায় বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ, হয়তো পরে।'

আমরা যখন রেডিও স্টেশন অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন জিএসও-১ তার অফিসে অন্য একটি পরিস্থিতি সামলাচ্ছিল। ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে মিলিটারি অপারেশনস ডিরেক্টর আনামকে জানায়, বিদ্রোহীরা বিমানবাহিনী চিফ, ডিজিএফআই, ডিজি এনএসআই এবং অন্য অফিসাররা যারা কিনা ব্যস্ত ছিলেন প্লেন হাইজ্যাক নেগোশিয়েশনে, তাদের বন্দি করেছে।

এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারে বিদ্রোহীরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এয়ারফোর্স অফিসার্স মেস ঘিরে রেখেছে, মুহুর্মুহু গুলি করছে ও অফিসারদের হত্যা করছে। ডিএমও আনামকে এও জানালো যে তার কাছে আনকনফার্মড রিপোর্ট আছে যে উপরাষ্ট্রপতিও আটকা পড়েছেন কন্ট্রোল টাওয়ারে।

হেডকোয়ার্টারে দুই প্লাটুন স্পেশাল ব্যাটালিয়নের ফোর্স ছিল। আমি ইমতিয়াজকে আদেশ দিলাম এক প্লাটুন ফোর্সকে এয়ারপোর্টের দেয়াল টপকে পাঠাতে। বলে দিলাম ওরা যেন সোজা কন্ট্রোল টাওয়ারে চলে গিয়ে অফিসারদের উদ্ধার করে। অন্য প্লাটুনকে ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং দখল করতে আদেশ দিলাম। আরো কিছু ট্রুপসকেও এতে অংশগ্রহণ করার কথা বললাম।

মেজর মোস্তফা, ক্যাপ্টেন সাদেক, ক্যাপ্টেন হোসেন এবং ক্যাপ্টেন তাহেরের নেতৃত্বে ফোর্স এগোতে থাকলো টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের দিকে। বিদ্রোহীদের এনকাউন্টার করতে করতে ওরা ১৫ মিনিটেই পৌঁছে গেলো ওখানে। প্রচণ্ড গোলাগুলি হলো দুপক্ষেই। কিছু বিদ্রোহী মারা পড়লো টারমাকে। কিছু পালিয়ে বাঁচলো। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। ওরা এর মধ্যেই ১১ জন এয়ারফোর্স অফিসারকে হত্যা করেছে। ৬০ জন বিদ্রোহীকে টার্মিনাল ভবন থেকে পাকড়াও করা হলো এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হলো।

জিএসও-১ ঢাকা ব্রিগেডকে আবার ট্রুপসের জন্য অনুরোধ করলো। এ সময় কিন্তু আবারও তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলো এই অজুহাতে যে একরকম গোলাগুলির মধ্যে ট্রুপস পাঠানো কঠিন।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে উদ্ধার করা হলো উপরাষ্ট্রপতি, বিমানবাহিনী প্রধান, পররাষ্ট্র সচিব এবং অন্য অফিসারদের। উপরাষ্ট্রপতি সোজা বাসায় গেলেন এবং বিমানবাহিনী প্রধান ও পররাষ্ট্র সচিব আমার অফিসে চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে তারপর বাসায় গেলেন।

এদিকে আনুমানিক সাড়ে ৬টা থেকে ৬টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ২০০ জন বিদ্রোহীকে ক্যাপ্টেন তাহেরের নেতৃত্বে স্পেশাল ব্যাটালিয়নের এক প্লাটুন ফোর্স ফার্মগেটে থামিয়ে দেয়। ওদের ধরার জন্য তার প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত ফোর্সের। জিএসও-১ অনুরোধ করলো ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডারকে। কিন্তু সে বললো, তার কাছে দেওয়ার মতো ট্রুপস নেই। এর ফলে বিদ্রোহীরা পালিয়ে যেতে সফল হলো। যেহেতু রাস্তায় ইতোমধ্যেই গাড়ি-ঘোড়া চলাচল শুরু করেছে এবং বাসাবাড়ির দরজা-জানালা দিয়ে উৎসুক জনতা বিষয়টি দেখছিল, তাই গুলি করার চিন্তা বাদ দেওয়া হলো।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও স্টেশন এবং এয়ারপোর্ট দখলের পাশাপাশি শহীদ বাশার রোড, বনানী রেলক্রসিং, মহাখালী এবং তৃতীয় এমপি গেটে চেকপোস্ট বসানোর কাজ সম্পন্ন হলো। নবম পদাতিক ডিভিশন পুরো এলাকায় নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করলো এবং সকাল ৮টার মধ্যে সব বিদ্রোহীকে ধরে ফেললো।

এভাবে বিদ্রোহ দমনের বিস্তারিত তুলে ধরে জেনারেল শওকত জানান, সব কিছু শেষ হলে অনেক তদন্ত হলো। কিন্তু আজ অবধি কিছু জিনিস যা কিনা আর্মির শৃঙ্খলা এবং মূলনীতির বিরুদ্ধে তা তার কাছে স্পষ্ট নয়। প্রথমত, সমস্যা শুরুর আগেই কেন বাইরের কিছু অফিসার ৮ম ইস্টবেঙ্গলে গেলো? তারা কি এমন কিছু জানতো যা নবম ডিভিশন জানতো না? দ্বিতীয়ত, কেন ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার সমস্যা শুরুর আগেই ৮ম ইস্টবেঙ্গলে তার বিছানাপত্র সরিয়ে নিলো? তৃতীয়ত, কেন সিজিএস তার পরিবারকে অক্টোবরের ১ তারিখ ১২:০০টায় শহরে সরিয়ে নিলো? চতুর্থত, স্ট্যাটিক সিগন্যাল-এর কমান্ডিং অফিসার রাত ৯টায় ইউনিটের ভেতর এবং আশপাশে সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে জানায় আর্মি ইন্টেলিজেন্সকে। কেন আর্মি ইন্টেলিজেন্স তথ্যটা নবম ডিভিশনকে জানালো না। যদিও বোঝা যায় কোন কোন রাজনৈতিক দল ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত ছিল।

প্রশ্ন হলো কে বিষয়টির পরিকল্পনা করছিল, কার জন্য এবং কী উদ্দেশ্যে?

উল্লেখ্য, জেনারেল শওকত তৎকালীন বিচার বিভাগীয় কমিশনে দেওয়া জবানবন্দিতে অনেক প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে জওয়ানরা কেন বিদ্রোহ করলো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন–

আমি এই বিশেষ বিদ্রোহের সঠিক কারণটি বলতে পারবো না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা

থেকে দেখেছি যে কারণগুলো এরকম ঘটনার সূত্রপাত ঘটায়, এর মধ্যে রয়েছে :

১. স্বাধীনতার পর অনেক লোককে চরিত্র বিশ্লেষণ ছাড়াই আর্মিতে নেওয়া হয়। পরে দেখা যায় এদের মধ্যে অনেক ডাকাতও রয়েছে। আর রয়েছে সেসব লোক, যাদের বিরুদ্ধে এখনো কোর্টে কেস আছে। যদিও কিছু ভেরিফিকেশন করা হয় তার পরও আমরা দেখেছি পুলিশ তাদের কাজ ঠিকমতো করেনি।

২. আমরা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠার ফলে আর্মিতে র‍্যাংক এবং কমান্ড স্ট্রাকচারে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও ট্রেনিংয়ের অভাব রয়েছে।

৩. কিছু লোককে ভিন্নপথে চালানোর জন্য রাজনীতিকরা সম্ভবত কিছু দুর্নীতিমূলক পন্থা অবলম্বন করেছেন।

৪. সামরিক আইন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দায়িত্বে লম্বা সময় জড়িত থাকায় আর্মিতে ট্রেনিংয়ের সময় কমে যায়, যা কিনা ট্রুপসদের ডিসিপ্লিনের অভাবের জন্য দায়ী।

৫. একটি বিপথগামী মহলের প্রভাবের ফলে উচ্চাশা। যেমন একজন এলএলবি পাস এয়ারফোর্স সার্জেন্ট মনে করতো তার অফিসাররা যেহেতু ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট অথবা গ্রাজুয়েট পাস, তাই সে কোনো অফিসারের মর্যাদা পাবে না।

৬. কিছু রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক দল এবং আগ্রহী অন্য রাষ্ট্র।

৭. রাজনৈতিক মতাদর্শে মোটিভেটেড লোকজনদের সার্ভিসে অনেকদিন ধরে অবস্থান। এদের চিহ্নিত করে সার্ভিস থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল।

অফিসারদের হাতে জওয়ানদের নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা, এমন প্রশ্নে তিনি কমিশনকে জানান, না, সে রকম তিনি কিছু দেখননি। আর্মিতে সব শাস্তি কারেকশনের জন্য দেওয়া হয়, শাস্তি হিসেবে নয়।

বগুড়া ও ঢাকার ঘটনা একই রকম কিনা এবং সংগঠকরাও একই ব্যক্তি কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। বলেন, হতে পারে আলাদা ঘটনা অথবা যোগাযোগ থাকতেও পারে।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সেনাপ্রধান থাকা অবস্থায় রক্তপাতহীন এক অভ্যুত্থানে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। এরপর সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন দিয়ে ৯ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন পাকিস্তানে। সেনাবাহিনীতে তিনি পাকিস্তানপন্থী হিসেবেই চিহ্নিত ছিলেন। হয়েছিলেন জেনারেল জিয়ার ঘনিষ্ঠ। '৭৭-এর অভ্যুত্থানের পর তিনি ছিলেন জিয়ার ডেপুটি। অভ্যুত্থান ও পরবর্তী বিচারপ্রক্রিয়া সব কিছুই ঘটেছে তার সামনে। তাই তার অনানুষ্ঠানিক বক্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ।

জিয়া ক্যাঙ্গারু কোর্টে ৫০০ সিপাহিকে ফাঁসি দিয়েছেন

'৭৭-এর অভ্যুত্থানের সময় সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এইচ এম এরশাদ ছিলেন জেনারেল জিয়ার ডেপুটি। সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাবিরোধী হিসেবে তার অবস্থান স্পষ্ট ছিল। তার অনেক আদেশ সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গেছে। জেনারেল জিয়া তাকে সেনাপ্রধানও করেছিলেন। জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর এরশাদের নির্দেশেই জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করা হয়েছিল এমন অভিযোগ আছে। আবার জেনারেল জিয়া হত্যায় এরশাদের হাত রয়েছে বলে জিয়ার স্ত্রী খালেদা জিয়া প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছেন।

১৯৯০ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দুর্নীতির মামলায় তিনি কারাবন্দি হন। ১৯৯৫ সালে তার বিরুদ্ধে জেনারেল মঞ্জুর হত্যা মামলা দায়ের হয়। ১৯৯৭ সালে তিনি জামিনে মুক্তি পান। এরপর তাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও '৭৭-এর অভ্যুত্থান নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বারবারই বলেছেন, ওই সব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি চিঠির মাধ্যমে তার দল জাতীয় পার্টিকে নানা নির্দেশনা দিতেন, বলা যায় চিঠি দিয়েই তিনি দল চালাতেন। তিনিই ছিলেন দলের চেয়ারম্যান।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের সঙ্গেই তার মুক্তির ব্যাপারে দরকষাকষি হয়। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার মতৈক্য হয়। এ কারণে ক্ষমতাসীন বিএনপি তার বিরুদ্ধে নানা প্রচারণা চালায়। ওই সময় বিএনপির মুখপত্র দৈনিক দিনকালে তার বিরুদ্ধে নানারকম সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে। সে সময় অবশ্য জেনারেল মঞ্জুর হত্যার বিচারকার্যক্রম চলছিল। জেনারেল এরশাদ ওই মামলার প্রধান আসামি। মঞ্জুর হত্যায় জড়িত এমন অভিযোগে এরশাদকে নিয়ে বেশ কিছু

প্রতিবেদন দিনকালসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এমনই একসময় দলের নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশে চিঠি লিখেন জেনারেল এরশাদ। চিঠিতে বিএনপির বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচারণার কৌশল বাতলে দেন।

চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখেন '৭৭-এর ঘটনায় ক্যাঙ্গারু কোর্টে জেনারেল জিয়া ৫০০ সিপাহিকে ফাঁসি দিয়েছেন। এক-একটা বিচারকাজ সম্পন্ন করতে মাত্র ৫ মিনিট সময় লেগেছে। এরশাদের বিরুদ্ধে বিএনপির সমালোচনার জবাবে এসব বিষয় যেন সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় সে ব্যবস্থা নিতে এরশাদ দলের নেতাদের নির্দেশ দেন। এবং নিহত সৈনিকদের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করানোর পরামর্শও দেন এরশাদ। সবশেষে তিনি এই চিঠির বিষয় খুবই গোপন রাখতে বলেন। চিঠি থেকে উদ্ধার করা অংশ :-

Dear Presidium Members,

Nothing to worry, they cannot frame me. Emdad was forward but did not mention my name. He said about Aziz and Latif. Aziz is died and Latif has not said anything. He cannot, because I had no communication with him in those days.

দৈনিক দিনকাল লিখেছে আমি গুলি করার নির্দেশ দিয়েছি। এটা মিথ্যা এটা তারা বলতে পারে না। আপনারা অনেকেই lawyer, একটা defamation suit করা উচিত। অন্যরা সাবধান হবে। আর হারাবার কিছু নেই। BNP desperate ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলতে হবে। গুলি শুধু KZ-এর ওপরেই নয় আপনাদের ওপরেও হবে। ভয় করলে আমরা হারিয়ে যাবো। সংবাদে মেজর রফিকের রূপকথার কাহিনী পড়ছি। আপনারা protestও করেন না। president থাকতে আমি CAS কিভাবে সদরুদ্দিনকে Radio station Bomb করতে বলতে পারি। গাঁজাখুরির একটা সীমা আছে।

৫০০ জন সিপাহিকে জিয়া ফাঁসি দিয়েছে। আমি CAS হই 1st December 1978. তার আগে জিয়া president ও CAS দুই পদেই বহাল ছিল। আমার CAS হবার আগেই জিয়া অত ফাঁসি কার্যকর করে। আমি মাত্র নামকাওয়াস্তে DCAS তখন। how can I be this involved। এই ফাঁসির কাগজগুলো জিয়ার দস্তখত সমেত একজনকে দেখতে বলুন। এক-একটা ফাঁসির, বিচার হয়েছে ৫ মিনিটে। জনগণ জানুক।

ভোর ৪.৩০ মিনিটে MSP জেনারেল সাদেক আমাকে president হত্যার খবর দেয়। VP তখন হাসপাতালে (CMH)। আমি cabinet secretary কেরামত আলীকে telephone করে ওনাকে নিয়ে CMH এ সাত্তারকে president ঘোষণা করি। তৎকালীন DIG শাহজাহান আমাকে খবর দেয় নাই। মেজর রফিকের ভাষ্য let us put the plan in action is a lie. তিন জজের enquiry report প্রকাশ করতে বলুন, court martial-এ

মেজর এমদাদের statement আমাদের একজনের কাছে আছে। paper-এ ছাপাতে বলুন। পুরা court martial proceeding জনগণের জন্য প্রকাশ করতে বলুন। দেখবেন এর মধ্যে জেঃ শওকত জড়িত ছিল। statementগুলো বই আকারে একজন সাংবাদিকের কাছে দেওয়া আছে। KZ তাকে চেনে। এটা ছাপিয়ে চুপে চুপে সবার মধ্যে বিলি করলে অনেকের involvement ধরা পড়বে।

চুপ করে বসে থাকবেন না। বিএনপি এখন ফাটা বাঁশে আটকা পড়েছে। তাহেরের বিচারের file চান ও মিসেস তাহেরকে দিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে কেস করান।

কোন কোন সিপাহিদের kangaroo court করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে– তাদের পরিবারদের প্রত্যেককে কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ চেয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে কেস করতে বলুন।

Allah is great. He has given us a golden opportunity don't miss it.

Tell all workers we want to go to power by the grace of Allah… nobody wants to vote for 3rd party, iron out your difference be together and… this God given opportunities save my life and also save...

Your HM

Ps: please maintain complete secrecy about this. I don't want to see this printed in the newspaper. It will be dangerous for me...

[KZ - কাজী জাফর
CAS - চিফ অব আর্মি স্টাফ
DCAS - ডেপুটি চিফ অব আর্মি স্টাফ
MSP - মিলিটারি সেক্রেটারি টু দ্য প্রেসিডেন্ট
VP - ভাইস প্রেসিডেন্ট
CMH - কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল

(অনেক পুরোনো চিঠি এবং হাতের লেখা অস্পষ্ট হওয়ায় বেশ কিছু শব্দ উদ্ধার করা যায়নি, পরিশিষ্ট ৪-এ জেনারেল এরশাদের নিজ হাতে লেখা চিঠিটি হুবহু দেওয়া আছে)]

এ জি মাহমুদ

১৯৭৭ সালের অভ্যুত্থান সম্পর্কে প্রতিবেদনগুলো প্রকাশের আগে অভ্যুত্থানকালীন বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করা হয়। '৯৬-৯৭ সালে বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি ঐ বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না বলে জানান। তিনি মনে করেন জেনারেল জিয়া ও জেনারেল মঞ্জুর অভ্যুত্থান সম্পর্কে জানতেন কিন্তু তারা কেউ বেঁচে নেই। ঘটনাগুলো ভালো করে জানার মধ্যে একমাত্র তিনি বেঁচে আছেন। তাই মিডিয়ায় এ সম্পর্কে কিছু বললে প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তার আশঙ্কা।

যদিও '৭৭ সালের অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সামরিক ট্রাইব্যুনালের নামে গণফাঁসি থেকে তার সৈনিকদের রক্ষা না করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ঐ সময় বিদ্রোহ দমন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এমন একজন সেনা কর্মকর্তা মনে করেন এ জি মাহমুদ আসলে আন্তর্জাতিকভাবে হিরো হওয়ার জন্য জাপানি বিমান ছিনতাই ঘটনার সমঝোতায় ব্যস্ত ছিলেন। তাই তার সৈন্যদের রক্ষা কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কোনো চিন্তা করেননি। পরবর্তী সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে দেওয়া তার বক্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

ভোরের কাগজে ধারাবাহিক প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ হওয়ার ১০ বছর পর এ জি মাহমুদ মুখ খুললেও বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেন। বিভিন্ন সময় তার কাছে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী '৭৭-এর অভ্যুত্থান ছিল জিয়া-তাহেরের রেষারেষির ফল। তিনি বিমানবাহিনীর প্রধান হয়ে নিরপরাধ বিমানসেনাদের বাঁচাতে কেন উদ্যোগ নেননি, এমন প্রশ্নে বলেন– সে সময় তিনি নিজেও নিরাপদ ছিলেন না। এয়ার হাউসেও তিনি থাকতে পারতেন না।

জিয়া-তাহেরের রেষারেষির চূড়ান্ত পরিণতি

এ জি মাহমুদ মনে করেন, সেদিনের ঘটনা ('৭৭-এর অভ্যুত্থান) ছিল একটি মিলিটারি পলিটিকো (রাজনৈতিক-সামরিক) সংঘাত। এই ঘটনার সঙ্গে সেনানিবাসের বাইরের রাজনৈতিক শক্তিও জড়িত ছিল। এটি ছিল মূলত জিয়া ও কর্নেল তাহেরের সমর্থকদের মধ্যকার রেষারেষির চূড়ান্ত পরিণতি। তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া হলেও দেশে বিভিন্ন সেনানিবাসে তার অসংখ্য সমর্থক রয়ে যায়। তাহেরের ফাঁসির কারণে তারা আরো ফুঁসে ওঠে।

তিনি বলেন, সেদিন শুধু বিমানবন্দরেই সংঘর্ষ হয়নি। ঢাকার বিভিন্ন স্থানেও সংঘর্ষ

হয়েছিল। কর্নেল তাহেরের অনুগতরা ঢাকা বেতারকেন্দ্র দখল করে সেখান থেকে বিপ্লবী প্রচারণা চালায়। তবে জিয়ার সমর্থকরা অল্প সময়ের মধ্যেই কর্নেল তাহেরের সমর্থকদের দমন করে ফেলে। বিমানবাহিনীর সদস্যরাই সেদিনের ঘটনার বেশি শিকার হয়। কারণ ছিনতাইকৃত বিমানটিকে কর্ডন করে রাখতে সেদিন তারা সেখানে হাতিয়ারসহ পাহারায় ছিল। ঘটনার পর যাদেরই হাতিয়ারসহ প্রকাশ্যে পাওয়া গেছে তাদেরই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে তাদের অনেকেরই আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে আপনি আপনার সৈন্যদের রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, আমার কিছুই করার ছিল না। সামরিক আইন জারি থাকার কারণে ক্ষমতা ছিল একজনের হাতে। সামরিক আইন না থাকলে বিমানবাহিনীর সদস্যদের কোনো অন্যায় হলে আমিই বিচার করতাম। এ ছাড়া জিয়ার জায়গায় আমি থাকলে হয়তো অন্যভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতাম। ফলে হয়তো এত লোকক্ষয় হতো না। জিয়াউর রহমান অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন।

ঘটনার সময় ছিনতাইকৃত বিমানটিকে কর্ডন করে রেখেছিল বিমানবাহিনীর সদস্যরা। আর বিমানবন্দরের দায়িত্বে ছিল পুলিশ। তাহলে সেনাবাহিনী এলো কোথা থেকে– এ প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, হামলার পূর্ব মুহূর্তে রহস্যজনকভাবে দায়িত্ব থেকে পুলিশকে সরিয়ে ফেলা হয়।

এ জি মাহমুদ ঐ অভ্যুত্থানে অনেক কিছুই জানতে পারেননি বলে দাবি করেন। বলেন, 'প্রকাশ্যে বিচার হলে, সব তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ পেলে '৭৭-এর ঐ ঘটনা রহস্য হয়ে থাকতো না, আমার কাছে আজও ঐ ঘটনা রহস্যই হয়ে আছে।'

তেজগাঁও বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারে জাপানি বিমান ছিনতাইকারীদের সঙ্গে সমঝোতায় ব্যস্ত বিমানবাহিনীর কর্মকর্তারা।
সর্ব বাঁয়ে তৎকালীন বিমানবাহিনী প্রধান এ জি মাহমুদ

হাসানুল হক ইনু

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর বর্তমান সভাপতি হাসানুল হক ইনু ছিলেন তৎকালীন জাসদের গোপন সশস্ত্র শাখা বিপ্লবী গণবাহিনীর উপ-প্রধান। কর্নেল তাহের ছিলেন এর প্রধান। তাহেরের উদ্যোগেই গণবাহিনীর শাখা সংগঠন হিসেবে সেনা সদস্য, জেসিও, এনসিও ও জওয়ানদের নিয়ে সেনাবাহিনীর ল্যান্সার, আর্টিলারি, সিগন্যাল ও ইনফেন্ট্রি ইউনিট এবং বিমানবাহিনীতে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গঠিত হয়। এই দুই সংগঠন তখনকার ঘটনা প্রবাহে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়া সামরিক আদালতে বিচারের মাধ্যমে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেন এবং ইনুসহ জাসদ ও গণবাহিনীর শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করে কারাবন্দি করেন। ইনু গ্রেপ্তার হন '৭৫ সালের ২৩ নভেম্বর। বিচারে তার ১০ বছর সাজা হয়। ৫ বছর পর ১৯৮০ সালে ১৩ জুন তিনি মুক্তি পান। সেই অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা তার কাছে ভিন্নরকম।

হাসানুল হক ইনু ২ অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে তাহের অনুসারীদের যোগসাজশের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বরং তিনি মনে করেন সশস্ত্র বাহিনীতে নিজের অবস্থান সুসংহত করতেই জিয়া প্রতিপক্ষ নির্মূল অভিযান চালান।

তাহের অনুসারীরা অভ্যুত্থানে জড়িত ছিল না

হাসানুল হক ইনু বলেন, বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট আফসারের নেতৃত্বে শতাধিক সৈন্য ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ঢাকা বিমানবন্দরে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা চালায়। এই আফসার গণবাহিনী অথবা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কেউ ছিল না। সে জাসদের রাজনীতির সঙ্গেও কখনো জড়িত ছিল না।

ইনু বলেন, সামরিক আদালতে আফসার বলেছে ২ অক্টোবর হত্যাকাণ্ডের জন্য সে নিজেই দায়ী। তার একক নেতৃত্বেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর থেকে প্রমাণ হয় তাহের সমর্থকরা অভ্যুত্থানে জড়িত ছিল না। তাহের সমর্থকরা জড়িত থাকলে অভ্যুত্থান বিক্ষিপ্ত হতো না; বরং আরো সংগঠিত হতো।

গণহারে ফাঁসি দিয়ে সৈনিক হত্যার জন্য জিয়াউর রহমানকে দায়ী করে তিনি বলেন, জেনারেল জিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ঢাকা বিমানবন্দরে রক্ত ঝরেছে। নিহত হন বিমানবাহিনীর ১১ জন অফিসারসহ অসংখ্য সৈনিক। ১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের কৃপায় বেঁচে গিয়ে জিয়া অফিসার ও সিপাহিদের ১২ দফা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে তা ভুলে

যান। ফলে সেনানিবাসগুলোতে অফিসার ও সিপাহিদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়। এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২ অক্টোবর। কর্নেল তাহেরের সমর্থকরা এর সঙ্গে জড়িত ছিল না। কারণ ১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বরের পর আমরা গণবাহিনী ও সৈনিক সংস্থার তৎপরতা বন্ধ করে দিই। জিয়া ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়া সত্ত্বেও ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানে জাসদ, গণবাহিনী অথবা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয় প্রমাণ করতে পারেননি।

তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর তিনটি পক্ষ এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রথমত, বঙ্গবন্ধুর খুনি কর্নেল ফারুক ও রশিদ সমর্থকরা। কারণ জিয়া খন্দকার মোশতাকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি অনুসরণ করলেও ফারুক-রশিদদের ক্ষমতার ভাগ দেননি। বরং ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঘটনার পর তাদের বিদেশ পাঠিয়ে দেন। ইনু জানান, ১৯৭৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বগুড়া সেনানিবাস থেকেই সংঘর্ষের সূচনা হয়। আর তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ঢাকা বিমানবন্দরে। বগুড়া সেনানিবাসের সংঘর্ষটি ছিল জিয়া এবং কর্নেল ফারুক-রশিদ সমর্থকদের মধ্যকার সংঘর্ষ। দ্বিতীয়ত, প্রতিশ্রুত ১২ দফা বাস্তবায়ন না করায় সামরিক বাহিনীর একটি বিক্ষুব্ধ অংশও জিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে জড়িয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, জিয়া সশস্ত্র বাহিনীতে 'ভাগ করো-শাসন করো' এই নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন। তিনি প্রথমে পাকিস্তান ফেরত ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিভক্ত করে ফেলেন। এ কারণে মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা জিয়ার ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। লে. কর্নেল দিদারুল আলমের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাটি ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ।

ইনু জানান, ক্ষমতায় থাকতে জিয়ার বিরুদ্ধে প্রায় ১৯টি অভ্যুত্থান হয়। এসব অভ্যুত্থানকে কাজে লাগিয়ে জিয়া সশস্ত্র বাহিনীতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান চালান। এতে প্রায় আড়াই হাজার সৈন্য প্রাণ হারান। বিচারের নামে গণহত্যা চালানো হয়। মেজর জেনারেল মীর শওকত ও মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুরকে ব্যবহার করে জিয়া এসব করেছেন। পরে তাদেরও ছুড়ে ফেলে দেন। শওকতকে যশোর এবং মঞ্জুরকে চট্টগ্রামে বদলি করেন।

ইনুর মতে, জিয়ার বিরুদ্ধে সংঘটিত ১৯টি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে একমাত্র ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থানই সাধারণ সৈনিকরা ঘটায়। ২ অক্টোবর বিমানবন্দরে হামলার আগে সাধারণ সৈনিকরা সেনানিবাসে জিয়ার বাসভবনেও হামলা চালিয়েছিল। তিনি অবশ্য আগে থেকেই বাসার চারপাশে ব্যাপক নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সৈনিকরা সুবিধা করতে পারেনি।

জিয়া সশস্ত্র বাহিনীর ওপর তার বর্বরতা আড়াল করতে জাসদ, ডেমোক্রেটিক লীগ ও সিপিবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন দাবি করে ইনু বলেন, জিয়ার সামরিক শাসনামলে একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটির কোনো যোগসূত্র পাওয়া যেতো না। যেমন, অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছে বলা হচ্ছে একটি গ্রুপ, বাস্তবায়ন করেছে বলা হচ্ছে আরেকটি গ্রুপ। আর গণফাঁসি দেওয়া হচ্ছে অন্য একটি গ্রুপকে।

সাখাওয়াত হোসেন
ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন স্বাধীনতার পর দুই বছর পাকিস্তানে বন্দিশিবিরে কাটিয়ে '৭৩ সালে দেশে ফেরেন এবং '৭৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেডে স্টাফ অফিসার ছিলেন। তিনি '৭৯ থেকে '৮১ সাল পর্যন্ত সেনা সদরে অপারেশন ডাইরেক্টরেটে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশ রাইফেলস-এ (বিডিআর) ছিলেন। পোস্টিং ছিল খুলনায়। আর ২ অক্টোবর অভ্যুত্থানের দিন ঢাকায় ছিলেন ছুটিতে।

ব্রিগেডিয়ার এম সাখাওয়াত হোসেন এনডিসি, পিএসসি (অব.) তার 'বাংলাদেশ : রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১' বইতে ১৯৭৭-এর অভ্যুত্থান নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। এ বর্ণনায় জানা যায়, একজন সেনা কর্মকর্তার দৃষ্টিতে সেই ব্যর্থ অভ্যুত্থান কেমন ছিল।

দ্বিতীয় সিপাহি বিপ্লব

একটি বড় ধরনের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সালে। এ ব্যর্থ রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে বিমান ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ১৯৭৫ সালে সিপাহি বিপ্লবের অনুকরণের চেষ্টা করে। এ অভ্যুত্থানেও কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সেনা সংস্থার (বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা) কিছু সদস্যের যোগসাজশ পাওয়া যায়। মনে করা হয় জেএসডি (জাসদ) এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আর একবার ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। আর এ প্রচেষ্টায় বিমানবাহিনীর অনেক নিরীহ চৌকস অফিসার প্রাণ হারান।

এ অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয় ১৯৭৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে, যখন জাপান এয়ারলাইন্সের ডিসি-৮ বিমান টোকিও থেকে ১৫৬ জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 'হিকাদা কমান্ডো' ইউনিট নামে জাপানি সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক হাইজ্যাক হয়ে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয় (বইতে ভুলবশত তারিখটি ২৮ মে ছাপা হয়)। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম এবং এ ধরনের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার মতো অভিজ্ঞতা ও স্পেশাল ফোর্স এবং যন্ত্রপাতি সব কিছুরই অভাব ছিল। জিয়া সরকার বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদকে প্রধান করে বিমানবাহিনীকে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব দেয়।

উল্লেখ্য, এর কয়েক মাস পূর্বে জিয়া আর তওয়াবের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে তওয়াবকে বিমানবাহিনী প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে এ জি মাহমুদকে বিমানবাহিনী প্রধান করা হয়েছিল। এ হাইজ্যাকিংয়ের মধ্যস্থতার সঙ্গে ঢাকায় অবস্থানরত অনেক সেনা ও

বিমানবাহিনীর অফিসার জড়িয়ে পড়েন। অনেকেই তেজগাঁও বিমানবন্দরেই অবস্থান নেন। বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে পড়ে। যেহেতু এ হাইজ্যাকিংয়ের মধ্যস্থতার আর ঘটনার বিবরণ টেলিভিশনে সরাসরি প্রচার করা হচ্ছিল বলে পুরো দেশবাসীই টেলিভিশনের পর্দার সামনে ভিড় জমিয়েছিল। যখন সমগ্র দেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে এ নাটক প্রত্যক্ষ করছিল, ঠিক এ সময়ে বগুড়া সেনানিবাস থেকে শুরু হয় আরেক সিপাহি বিপ্লব। প্রথমে বেশ কিছু অফিসার নিহত হন। তাদের একজন লেফটেন্যান্ট হাফিজুর রহমানের লাশ ঢাকায় দাফনের সময় তার বাবা-মা আত্মীয়স্বজনরা উপস্থিত সৈনিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলে সেখানেই ছোটখাটো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। যশোর থেকেও সৈনিকদের ভেতরে অসন্তোষ দেখা দেওয়ার খবর আসতে থাকলে ঢাকায় সতর্ক অবস্থা নেওয়া হয়। এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ২টার পর থেকেই শুরু হয় ঢাকা সেনানিবাসের দ্বিতীয় 'সিপাহি বিপ্লব'। বিপ্লবী সৈনিকরা, যার মধ্যে বেশির ভাগ ছিল বিমানবাহিনীর সদস্য। তারা বিমানবন্দরে হামলা করে সেখানে কার্যরত ১১ জন বিমানবাহিনী অফিসারকে হত্যা করে। আশ্চর্যজনকভাবে বিমানবাহিনীর প্রধান প্রাণে রক্ষা পান। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বিপ্লবী সৈনিকরা রেডিও স্টেশন দখল করে বিপ্লবী নেতার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সে নেতার আবির্ভাব হয়নি। যা হোক, সাভার ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এ ঘোষণা দেশবাসী পর্যন্ত পৌঁছেনি। সেদিন এ ঘোষণায় বিমানবাহিনীর জনৈক সার্জেন্ট আফসারকে রাষ্ট্রপ্রধান করা হয়েছিল। এ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে মীর শওকত আলী ৯ম ডিভিশনকে নিয়োগ করলে ক্ষিপ্রগতিতে এ অভ্যুত্থান প্রচুর রক্তপাতের বিনিময়ে ব্যর্থ করা হয়। কিন্তু ততক্ষণে ঝরে যায় অনেক রক্ত, লাল হয়ে যায় বিমানবন্দর এলাকা। নিহত হন ১১ জন খ্যাতি ও উদীয়মান বিমানবাহিনীর অফিসার। সকালে জিয়াউর রহমান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার দায়ে বহু সৈনিককে গ্রেপ্তার করে সামরিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত বিচার করে অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়। এখানে তাদের সঠিক সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনীর সিগন্যাল ও সাপ্লাই কোরের কিছুসংখ্যক সৈনিক ছাড়া আর কোনো ইউনিটের সৈনিকরা উল্লেখজনকভাবে যোগদান না করায়।

এ ঘটনা জিয়াউর রহমানকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। এ ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবাহিনী প্রধান এ জি মাহমুদকে পরিবর্তন করে এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিনকে বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা ও কৃতিত্ব নিয়ে ৯ম ডিভিশনের মীর শওকত আলী এবং সিজিএস মঞ্জুরের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছলে জিয়া দুজনকেই ঢাকার বাইরে– মীর শওকত আলীকে যশোর ডিভিশন কমান্ডার, আর মঞ্জুরকে ২৪ পদাতিক ডিভিশন চট্টগ্রামে বদলি করে ঢাকার ক্ষমতাবলয় থেকে সরিয়ে দেন। মীর শওকত আলী এ বদলির আদেশ গ্রহণ করলেও মঞ্জুর এ ব্যবস্থায় খুশি হতে পারেননি।

লরেন্স লিফশুলজ
প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ '৭৭-এর ঘটনার পরপরই এ বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি এখনো বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে নানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। '৭৭-এর অভ্যুত্থান নিয়ে ভোরের কাগজে লেখকের প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো তিনি সংগ্রহ করেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি লেখকের সঙ্গেও দীর্ঘ আলোচনা করেন। ২০১১ সালের ২১ জুলাই কর্নেল তাহেরের ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি ১৯৭৭ সালের সেই 'বিদ্রোহের' সময় আসলেই কী ঘটেছিল, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে লিখেছেন, আজ ৩০ বছরের বেশি সময়ের পরও সেটা এক জ্বলন্ত প্রশ্ন হয়ে আছে। অনেকে আমার সঙ্গে দ্বিমত করে বলেন, এটা আদতে কোনো বিদ্রোহই ছিল না। আসলে এটা ছিল সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে জিয়ার শত্রুদের 'টোপ দিয়ে বের করে আনার' গোয়েন্দা অভিযান।

যেকোনো স্থানে অবিচার সর্বত্রই ন্যায়বিচারের হুমকি

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। আমি তখন ইংল্যান্ডে থাকি। সাংবাদিকতার চাকরি থেকে স্যাবাটিক্যাল ছুটি নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পড়তে গেছি। ১৯৭৭ সালের শরতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো। সে সময় অ্যামনেস্টির কাছে বিপুল পরিমাণ গোপন প্রতিবেদন আসছিল, যেগুলোতে এমন তথ্য ছিল যে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরে আপাতবিদ্রোহ ঘটার পর গণহারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছে।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব মার্টিন ইনালস বিশেষ সফরে ঢাকা আসেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ সরকারি নেতাদের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে আলোচনা করা। জেনারেল জিয়ার সঙ্গে ইনালস সাক্ষাৎ করেন। জিয়া তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে 'সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অভ্যুত্থান-চেষ্টার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে ছিল, তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বন্ধ হয়েছে।'

কিন্তু ইনালস লন্ডন ফিরে যাওয়ার পর অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনে বলা হয়, '[জেনারেল জিয়া কর্তৃক] এসব আশ্বাস প্রদান করা সত্ত্বেও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিশ্বাস করার জোরালো কারণ আছে যে সেনাসদস্যদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা... এখনো অব্যাহত আছে... ১৯৭৮ সালের ১৯ জানুয়ারি এক তারবার্তায় অ্যামনেস্টির মহাসচিব

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এমন খবরে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, ২ অক্টোবরের পর শত শত সেনাসদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অব্যাহত আছে।'

১৯৭৮ সালের ৫ মার্চ লন্ডনের দ্য সানডে টাইমস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, 'গত অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০০ সেনাসদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এই রক্তগঙ্গা কেবল আংশিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গত সপ্তাহের প্রতিবেদনে... বিমানবাহিনীর সাবেক এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দ্য সানডে টাইমসকে বলেছেন, ৩০ সেপ্টেম্বর বগুড়ায়, আর ২ অক্টোবর ঢাকায় অভ্যুত্থানের পর সামরিক ট্রাইব্যুনালে ৮০০-এর অধিক সেনাসদস্যকে দণ্ডিত করা হয়েছে। সামরিক আদালতের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যাঙ্গারু কোর্টের পার্থক্য খুব বেশি নয়। ঢাকায় প্রায় ৬০০ সেনাসদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে ফায়ারিং স্কোয়াডে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে।'

১৯৭৮ সালের ২৫ মার্চ মুম্বাইয়ের ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির প্রতিবেদনে বলা হয়, 'যদিও অ্যামনেস্টি শুধু এটুকুই বলতে প্রস্তুত যে 'কমপক্ষে ১৩০ জন এবং সম্ভবত কয়েক শ'-এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে, তবে ঢাকার কিছু ওয়াকিবহাল সূত্রের মতে এ সংখ্যা ৭০০ পর্যন্ত হতে পারে। প্রকৃত সংখ্যা নিশ্চিত করার উপায় নেই। ঢাকায় প্রচারিত টাইপ করা একটি কাগজের বিবরণীতে অভিযোগ করা হয়েছে, সেনা সদর দপ্তর থেকে টেলিফোনে নির্দেশ পেয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হতে পারে, এ আশঙ্কায় কোনো নথিপত্র রাখা হচ্ছে না। একটি ঘটনায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি সৈনিকদের গভীর রাতে জাগিয়ে তোলা হয় এবং তাদের গোছগাছ করে নিতে বলা হয়।'

'তাদের বলা হয়, তাদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ এসেছে। সেলগুলোতে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়, জোয়ানরা তাদের মালামাল জড়ো করে। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় জেলের সামনের গেটে। জানা যায়, সেখানে একজন সেনা কর্মকর্তা ও বিশেষ আধাসামরিক বাহিনীর এক সদস্য তাদের বাধা দেন। সেখানে হঠাৎ মৃত্যুদণ্ডের রায় পড়ে শোনানো হয়। তাদের প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্য পাগলের মতো কান্নার রোলের মধ্যে জোয়ানদের নিয়ে যাওয়া হতে থাকে, আর একেক দফায় ১৭-১৮ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হতে থাকে।' সে রাতে যাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, তাদের তালিকাও প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, 'পুরো সময়জুড়ে ফাঁসির জন্য নিয়ে যেতে থাকা সৈনিকদের কান্নাকাটির ভেতরও কর্তৃপক্ষ ছিল শান্ত ও ধীরস্থির।' ঢাকায় এমন কথাও প্রচারিত হয়েছিল যে ফায়ারিং স্কোয়াডের সদস্যদের গুলি করার নির্দেশ দেওয়ার পরও গুলি না করায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এসবের কোনো কিছুই কোনো সংবাদপত্র ছাপার সাহস করেনি। সুতরাং দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রামাণিক নিশ্চিতকরণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।'

১৯৭৭ সালের সেই 'বিদ্রোহের' সময় আসলেই কী ঘটেছিল, আজ ৩০ বছরের বেশি সময়ের পরও সেটা এক জ্বলন্ত প্রশ্ন হয়ে আছে। অনেকে আমার সঙ্গে দ্বিমত করে বলেন, এটা আদতে কোনো বিদ্রোহই ছিল না। আসলে এটা ছিল সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে জিয়ার শত্রুদের 'টোপ দিয়ে বের করে আনার' গোয়েন্দা অভিযান। আনাড়ি হাতে অনেক ছড়িয়ে জাল পাতা হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, দেশের সামরিক বিচারের বিধিমালার লঙ্ঘন ঘটিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাইরে অজস্র মানুষের প্রাণ হরণ করা হয়েছিল।

২০০৬ সালে আমি প্রয়াত মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে ঢাকায় এক নৈশভোজে মিলিত হই। দুজন বিখ্যাত সাংবাদিক ও মইন চৌধুরীর বন্ধু সাবেক এক সেনা কর্মকর্তাও সেখানে ছিলেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি, লন্ডনে (বাংলাদেশ দূতাবাসের) সামরিক অ্যাটাশে থাকার সময় থেকে আমি তাঁকে চিনি। তখন প্রায়ই আমরা নৈশভোজে বসতাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর কাজ হলো আমার ওপর চোখ রাখা। আমিও বললাম যে ব্যাপারটা পারস্পরিক। তা হলেও মূলত তিনি আমার কাছ থেকে রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে কী পড়বেন, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন। আমার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁকে বই ধার দেওয়া।

২০০৬ সালের ওই সন্ধ্যায় আলোচনা ১৯৭৭ সালের বিদ্রোহের ঘটনাবলি প্রসঙ্গে গড়ালো। সে সময় জিয়ার অনুরোধে মইন লন্ডন থেকে ফিরে সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হয়ে বসলেন। সিদ্ধান্তটা বিচক্ষণোচিত ছিল না।

সেই সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বলেছিলেন, ২০০ জনের মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন তাঁর হাত দিয়ে হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতভাবে মোট কতজন সেনাকে হত্যা করা হয়েছিল, তা তিনি জানেন না। তাঁর হিসাবমতে, তাদের সংখ্যা শত শত। ওই সব মানুষের কেউই সুষ্ঠু বিচার পাননি বলে সেই সন্ধ্যায় মইন স্বীকার করেছিলেন। সেনাদের আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল আরজি করার অধিকারও ছিল। সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল তাদের। এসব ঘটনায় নিজের ভূমিকার জন্য তিনি অনুতাপ প্রকাশ করেন।

সেই নৈশভোজের অল্প কিছুদিন পর আমি ঢাকায় তাঁর বাসায় দেখা করতে চেয়ে ফোন করি। আমাদের মধ্যে আরো বিশদ আলোচনা হয়। নৈশভোজে তিনি যা বলেছিলেন, তা-ই সেদিন আরো বিস্তারিতভাবে জানান। চলে আসার সময় আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালের সেই বিপর্যয়ের সময় সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হিসেবে কৃতকর্মের জন্য তিনি সত্যি সত্যিই অনুতপ্ত।

সুতরাং এখানে আমরা সেনাবাহিনীর সাবেক অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলকে পেলাম। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কিভাবে ফাঁসিতে অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা সব সেনাকে সেনাবাহিনীর বিচারবিধি অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এসব

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। হুকুমদাতার ভূমিকায় ছিলেন জেনারেল জিয়া। মইন বলেছেন, জিয়া যা কিছু করেছেন, নিজের ইচ্ছেমাফিক করেছেন।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়ের বিষয়ে সত্য ও ন্যায়বিচার কমিশন গঠন করা হলে জেনারেল মইন স্বেচ্ছায় সেখানে সাক্ষ্য দিতে আসতেন। আমার মতে, তিনি খোলামনে তাঁর ভূমিকার দায়দায়িত্ব স্বীকার করতেন এবং অনুশোচনা প্রকাশ করতেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এই অধ্যায়ের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এমন লেখক হাতে গোনা। আমার জানামতে, আতাউস সামাদই প্রথম এই গণপ্রাণদণ্ডের বিষয়ে লিখেছিলেন। তবে সবচেয়ে বিশদ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিলেন জায়েদুল আহসান পিন্টু। ঘটনার ২০ বছর পর ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে ভোরের কাগজ-এ তাঁর প্রথম প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। এই গবেষণা তিনি আরো বিস্তৃত করে প্রকাশ করেন তাঁর একটি বই 'রহস্যময় অভ্যুত্থান ও গণফাঁসি'-তে।

জায়েদুল আহসান পিন্টু সারা দেশ ঘুরে বিভিন্ন জেলে যাদের প্রাণ হরণ করা হয়েছিল, সেই সব সেনার তালিকা সংগ্রহ করেন। তিনি সে সময় সেনা কমান্ডের সঙ্গে জড়িত অনেক উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকারও নেন। কিন্তু এদের কেউ নিহত সেনাদের প্রকৃত সংখ্যাটি বলতে পারেননি। যা ধারণা করা হয়েছিল, সেটাই ঘটেছে। অনেকগুলো ঘটনা থেকে মনে হয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং সযত্নে সত্য আড়াল করার বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছিল। তাই সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদের ভাষ্য ও ঘটনার পরপরই তৈরি করা তালিকার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অসঙ্গতি মিলতে থাকে।

যেমন : জায়েদুল আহসানের কাছে কুমিল্লা কারাগারের এক জল্লাদ দাবি করেন, তিনি ৯৩ জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের কাছে কোনো নথিপত্র নেই। আহসানের মতে, ১৯৭৭ সালের ২৬ অক্টোবর আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ বিভাগ (আইএসপিআর) থেকে প্রচারিত বক্তব্যে 'বগুড়া সেনাবিদ্রোহের' সঙ্গে জড়িত ৫৫ জন সেনাকে ফাঁসি দেওয়ার কথা বলা হলেও বগুড়া কারাগারে মাত্র ১৬ জনের নাম পাওয়া যায়। জায়েদুল আহসানকে বলা হয়েছিল, বাকিদের হত্যা করা হয়েছিল রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে। কিন্তু রাজশাহী কারাগারের পক্ষ থেকে বলা হয়, সেখানে কোনো নথিপত্র নেই।

জায়েদুল আহসানের ভাষ্যমতে, ১৯৭৭ সালে দুই হাজারেরও বেশি সেনাকে ৭ থেকে ২৬ অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে 'বিচারের মুখোমুখি' করা হয়েছিল। ধারণা করা হয়, বেশির ভাগ বিচার শুরু হয়েছিল ৭ অক্টোবর এবং প্রাণদণ্ড শুরু হয় ৯ অক্টোবর। এ দুই দিনের মধ্যে এসব মানুষকে নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করার কথা। আহসান আমাদের আরো জানান এবং জেনারেল মইনও আমাকে বলেছিলেন, এসব ছাড়াও জেনারেল জিয়া

৭ অক্টোবর নতুন বিধিমালা জারি করেন, যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনে আইনজীবীর সহায়তা নেওয়া কিংবা প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রহিত করা হয়। সামরিক বাহিনীর জন্য নির্ধারিত বিচারপ্রক্রিয়া লঙ্ঘিত হয় এতেও।

অবধারিতভাবে, সে সময় সামরিক বিধিমালার অধীনে যথাযথভাবে গঠিত কোনো ট্রাইব্যুনাল বাস্তবত ক্রিয়াশীল ছিল না। ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রাণদণ্ডের শিকার হওয়া সেনাদের সংখ্যাটি আহসান জানতে পেরেছিলেন সেই সময়ে ঢাকার নবম ডিভিশনের অধিনায়ক জেনারেল মীর শওকত আলীর কাছ থেকে। নিহত সেনাদের বিষয়ে এটাকেই সর্বনিম্ন মাত্রা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সংখ্যাটি হলো এক হাজার ১৩০। আসল সংখ্যাটি আসলে কত? কেউ জানে না। আহসানের বিশ্বাস, শত শত সেনাসদস্যকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়েছিল কোনো প্রমাণ না রেখে। মীর শওকতের দেওয়া সংখ্যার বাইরেও যেমন অনেকে থেকে যেতে পারেন, আবার সবাই হয়তো এর অন্তর্ভুক্ত হতেও পারেন।

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

অ্যান্থনি মাসকারেনহাস বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীতে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান নিয়ে 'বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড' বইটি রচনা করেন। তাঁর বইটি 'বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ' নামে বাংলায় অনুবাদ করেন মোহাম্মদ শাহজাহান। এই বইয়ে '৭৭-এর ২ অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা সম্পর্কে মাসকারেনহাসের পর্যবেক্ষণ।

বিচারকের লাইসেন্স নিয়ে সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছিল

১৯৭৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জেনারেল জিয়া মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে পরবর্তী বছর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য পদের ব্যাপারে আলোচনা ও সমর্থন আদায়ের জন্য কায়রোতে যান। বাংলাদেশের ঐ পদের জন্য শক্তিশালী জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা। সেই সময় প্রেসিডেন্ট জিয়ার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিসরীয় প্রেসিডেন্টের অবগতিতে ছিল সৌভাগ্যক্রমে, মিসরীয় গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা করে বামপন্থী একটা দল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাবে বলে খবর পেয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা ২৮ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনী দিবসে আঘাতটি হানার পরিকল্পনা করে। জাসদ ও কমিউনিস্ট পার্টির উসকানিতে ব্যাপারটি পরিচালিত হয় বলে জানা যায়। কায়রো থেকে জিয়া দেশে ফিরবেন ২৭ সেপ্টেম্বর। পরদিন অর্থাৎ ২৮ তারিখ বিমানবাহিনী দিবস। ঐ দিবসে জিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হওয়ার পরপরই ঘটনাটি ঘটানো হবে বলে পরিকল্পিত তথ্যটি জিয়াকে জানানো হয়।

প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের এই তথ্য শুনে জিয়া ঘাবড়ে যান। এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মিসরীয় গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, বিপ্লবী সিপাহিরা এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জিয়াসহ সব পদস্থ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করবে। মিসরীয় গোয়েন্দা সূত্রটি অবশ্য কোন ইউনিট এই ষড়যন্ত্রে জড়িত তা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি।

২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জিয়া বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদকে হাতে লিখে একটি ছোট নোট পাঠিয়ে দেন। তিনি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে নোটে উল্লেখ করেন। এতে কোনো কারণ তিনি দেখাননি। কিংবা সাদাতের সতর্কবাণীর কথাও উল্লেখ করেননি। সম্ভবত জিয়া বিমানবাহিনী প্রধানের আনুগত্য

সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না বলেই তিনি তাকে সব কিছু খুলে বলেননি।

শেষ মুহূর্তে জিয়ার অস্বীকৃতিতে বিমানবাহিনী প্রধান বিপদে পড়েন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে প্রেসিডেন্ট কোনো কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে এই অনুষ্ঠানে আসতে অসম্মতি জানিয়েছেন। ঐ অবস্থায় মাহমুদ জিয়ার জায়গায় অন্য কাউকে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপন করবেন, নাকি অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত এমন কী ঘটনা ঐ দিন ঘটে গেলো, যার জন্য অনুষ্ঠান আপনা-আপনিই মুলতবি হয়ে গেলো।

জাপান এয়ারলাইন্সের একটি ডিসি-৮ বিমান ১৫৬ জন যাত্রী নিয়ে বোম্বে থেকে উড্ডয়নের পরপরই হাইজ্যাক হয়। জাপানি রেড আর্মির হিদকা কমান্ডো ইউনিটের পাঁচজন হাইজ্যাকার বিমানটি হাইজ্যাক করে ঢাকায় অবতরণ করতে বাধ্য করে। তারা তাদের দলের ৯ জন কর্মীকে জেল থেকে মুক্তিদানের দাবি এবং যাত্রীদের জিম্মি করে তাদের মুক্তিপণ হিসেবে ৬০ লাখ মার্কিন ডলার দাবি করে। মধ্যরাতের মধ্যে তাদের দাবি মানা না হলে তারা একে একে সব যাত্রীকে খুন করবে বলে হুমকি দেয়।

ঢাকায় এই ধরনের আন্তর্জাতিক ঘটনা আর কোনো দিন ঘটেনি। এই ঘটনায় কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে জন্য মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মতে বিমানবাহিনী প্রধান এ জি মাহমুদ বিচারপতি সাত্তার (ভাইস প্রেসিডেন্ট) এবং দুজন ঊর্ধ্বতন বেসামরিক অফিসার নিয়ে কন্ট্রোল টাওয়ারে চলে যান। সেখান থেকে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে থাকেন। এভাবেই বিমানবাহিনী দিবস স্থগিত হয়ে যায়।

২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠান স্থগিত হয়ে যাওয়ার কারণে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের সৈন্যদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারলো না। দুদিন পর বগুড়ায় ২২ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাহিরা বিদ্রোহ করে এবং দুজন নবীন লেফটেন্যান্টকে হত্যা করে। কয়েকজন অফিসারকে আটকও করে তারা।

পরদিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টেও গোলযোগ দেখা যায়। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকেও একই ধরনের উত্তেজনার খবর আসে। জেনারেল জিয়া অবিলম্বে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে এক বৈঠকে বসেন। বৈঠকে অস্ত্রভাণ্ডার ও নিজ নিজ সেনা ইউনিটের প্রতি কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর জিয়া তার কয়েকজন সঙ্গীসহ শহরের একটি গোপনীয় নিরাপদ স্থানে চলে যান এবং সেখানেই তিনি তার অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার চালু করেন। সম্ভবত এতেই তার জীবন রক্ষা পায়।

আর্মি ফিল্ড সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা এ বিদ্রোহের আয়োজন করে। ঢাকার সিগন্যাল কমপ্লেক্স এর নেতৃত্ব দেয়। এদের বিদ্রোহ শুরুর সংকেত ছিল– একটা পটকা বিস্ফোরণ ও পরে একটি রাইফেলের গুলি। সংকেত পাওয়ার পরপরই সৈন্যরা তাদের

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের ইউনিটের অস্ত্রভাণ্ডার লুট করে। আকাশে ফাঁকা গুলি চালাতে চালাতে ওরা 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে স্লোগান দিতে দিতে একত্রে মিলিত হয়।

সিগন্যালম্যানদের সঙ্গে নিকটবর্তী কুর্মিটোলা এয়ারবেইস থেকে কয়েক শত এয়ারম্যান এসে যোগ দেয়। রাত পৌনে তিনটার দিকে ৭০০ আর্মি ও ২৫ ট্রাক ভর্তি বিমানবাহিনীর স্টাফ কেন্দ্রীয় অর্ডন্যান্স ডিপো লুট করে সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যায়। হাজার হাজার লিফলেটে সৈন্যদের বিদ্রোহের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়। এর আগের বিদ্রোহের সময় জিয়া ছিল নায়ক আর এবারের বিদ্রোহে তাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আখ্যায়িত করে তার 'অবসান' চাওয়া হয়।

ভোর ৫টায় ৭টি ট্রাকে ভর্তি হয়ে সৈন্য আর এয়ারম্যানরা রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। তারা বিপ্লবী সরকারের নামে ঘোষণা দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাদের নেতার নাম ঘোষণা করার আগেই নবম ডিভিশনের হেডকোয়ার্টারের নির্দেশে রেডিও ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে বিদ্রোহ বিমানবন্দরে ছড়িয়ে পড়ে এবং নৃশংস আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা প্রথমে বিমানবন্দরের হ্যাঙ্গারের সামনে দুজন বিমানবাহিনীর তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। তারপর গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাসুদকে বিমানবাহিনী প্রধানের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিমানবাহিনীর প্রধান অলৌকিকভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। বিদ্রোহীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে বিমানবাহিনীর উড্ডয়ন ক্ষমতা অর্ধেকে নেমে আসে।

এই বিদ্রোহ মূলত সেনাবাহিনীর সিগন্যাল ও বিমানবাহিনীর এয়ারম্যানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কোনো পদাতিক ইউনিট এতে অংশগ্রহণ করেনি। জেনারেল জিয়া ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেড ও ৯ম ডিভিশনের সাহায্যে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনেন।

জেনারেল জিয়াকে বিদ্রোহীরা খুঁজে পায়নি বলে সেদিন তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ২ অক্টোবর সকাল ৮টার দিকে বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে থেমে যায়। কুর্মিটোলা এয়ারবেইস থেকে তিন ট্রাক ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এরই মধ্যে জাপানি সন্ত্রাসীরা হাইজ্যাক করা প্লেনটি নিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার আগে ওরা দুই-তৃতীয়াংশ জিম্মিকে মুক্ত করে দিয়ে যায়। সেদিনই এই বিদ্রোহ দমনে সফলতার জন্য মিসরের প্রেসিডেন্ট জিয়াকে অভিনন্দন জানান।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সহজেই অনুমান করতে পারলেন যে এখন তার কেবল সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করলেই চলবে না। এ জন্য তার বেসামরিক দিক থেকেও সমর্থনের প্রয়োজন। তিনি প্রথমেই সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন্দল এবং বিরোধ সৃষ্টিকারী লোকদের বাছাই করে অত্যন্ত কঠোর হস্তে তাদের ওপর চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ডাইরেক্টর জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স, এয়ার ভাইস মার্শাল ইসলামকে বিদ্রোহের ব্যাপারে তাকে আগে সতর্ক করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বরখাস্ত করেন। তারপর তিনি

একের পর এক দ্রুতগতিতে বগুড়ার ২২ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ঢাকার চারটি সেনা ইউনিটকে বাতিল ঘোষণা করেন।

জেনারেল জিয়া বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকেও বাতিল করার চিন্তা করছিলেন।

এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ আমাকে জানিয়েছিলেন যে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে বিমানবাহিনীর ভাগ্য দোদুল্যমান অবস্থায় কাটে। জিয়া তখন বিমানবাহিনীকে বাতিল করে দিয়ে এটিকে সেনাবাহিনীর একটি অঙ্গ হিসেবে আর্মি এভিয়েশন উইং নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন চিফ অব জেনারেল স্টাফ, মেজর জেনারেল মঞ্জুর জেনারেল জিয়াকে এ ধারণাটি দিয়েছিলেন। ঐ অবস্থায় জিয়া কয়েক সপ্তাহ ধরে বিমানবাহিনীর প্রধান ও তার স্টাফদের ঢাকা বিমানবন্দরে অপারেশনাল এলাকাতেই আসতে দেননি। বিমানবাহিনীর প্রধান ঐ বিদ্রোহের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ায় জেনারেল জিয়া তাকে অবিশ্বাস করতে থাকেন। বিদ্রোহের ওপর বিচার বিভাগীয় কমিশন তদন্ত করে মাহমুদকে নির্দোষ প্রমাণ করলেও তিনি জিয়ার অধীনে কাজ করা অসম্ভব বলে মনে করেন। তিনি ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করেন।

জিয়া ঐ সুযোগে তার নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কমান্ডে কিছু রদবদল করেন। তিনি জেনারেল মীর শওকত আলীকে যশোরে আর জেনারেল মঞ্জুরকে পাঠিয়ে দেন চট্টগ্রামে। সাড়ে তিন বছর পর সেখানে বসেই জেনারেল মঞ্জুর জিয়াকে হত্যার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

জেনারেল জিয়া এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সৈনিক আর এয়ারম্যানদের ওপর ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য প্রতিশোধ নিয়ে তার মনে প্রজ্বলিত প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত করেন। সরকারি হিসাব মতে তিনি ১৯৭৭ সালে ... মাত্র দুই মাসের মধ্যে ১১৪৩ (এগারোশত তেতাল্লিশ) জন সৈনিককে ফাঁসির দড়িতে লটকিয়ে হত্যা করেন। তা ছাড় বহুশত সৈনিককে তিনি দশ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত সশ্রম কারদণ্ডে দণ্ডিত করে জেলে পাঠিয়ে দেন। আইনগত পদ্ধতি আর ন্যায়বিচারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে এ শাস্তির কাজ সমাপন করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় পৈশাচিক সাজার আর কোনো নজির নেই। তিন-চারজনকে একবারে বিচারের জন্য ডেকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হলো। জেনারেল জিয়া বসে বসে সেগুলো অনুমোদন করতেন এবং তার পরপরই তাদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হতো। উল্লিখিত পদ্ধতির সব কাজই মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হলো। তার সহযোগীদের একজন আমাকে জানিয়েছিল, জেনারেল জিয়া, প্রেসিডেন্ট আর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দ্বৈত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তার নিজের হাতে লিখে ঐ সব হতভাগ্য সৈনিকদের দণ্ডাদেশ অনুমোদন করতেন। বেসামরিক বন্দিরা স্মৃতিচারণা করে বলে, 'কয়েক সপ্তাহ ধরে জেলখানার রাতগুলো সৈনিকদের আর্তচিৎকারে বিভীষিকাময়

হয়ে উঠেছিল। তাদের ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা নির্দোষ বলে বুকফাটা চিৎকারে ভেঙে পড়তো।'

এইসব হত্যালীলার জন্য বিমানবাহিনী বা সেনাবাহিনীর কোনো প্রতিষ্ঠিত আইনকানুনকে মেনে চলা হয়নি। বিধি মোতাবেক শান্তির সময় কেবল জেনারেল কোর্ট মার্শাল মৃত্যুর দণ্ডাদেশ প্রদান করতে পারে। জেনারেল কোর্ট মার্শালের কমপক্ষে পাঁচজন মিলিটারি জজ থাকে। এদের মধ্যে একজনকে অন্ততপক্ষে লে. কর্নেল হতে হবে এবং বাকি চারজনের কেউই ক্যাপ্টেনের নিচে হতে পারবে না এবং কমিশন প্রাপ্তির পর ক্যাপ্টেনদের কমপক্ষে তিন বছর চাকরি সম্পন্ন করতে হবে। অভিযুক্তদের তাদের আত্মপক্ষ অবলম্বনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। জেনারেল জিয়া দেখলেন যে এই সব নিয়মকানুন তার উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট অন্তরায়। সে জন্য একটি 'মার্শাল ল' অর্ডার ঘোষণা করলেন। ঐ ঘোষণায় বিশেষ আদালতের নামে এমন কোর্ট তিনি সৃষ্টি করলেন, যেগুলোতে বিচারের জন্য একজন লে. কর্নেলের সঙ্গে হাবিলদার ও তার কাছাকাছি পদমর্যাদার লোকেরা বসতে পারতো। দ্রুতগতিতে মামলার কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এভাবেই ব্যবস্থা গৃহীত হলো।

এই উপমহাদেশের কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে নজির নেই। এক কলমের খোঁচায় জেনারেল জিয়া রাতারাতি দুই ডজনেরও বেশি এই ধরনের কোর্ট সৃষ্টি করলেন। ন্যায়বিচারের কোনো প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না। বিচারকের লাইসেন্স নিয়ে সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছিল মাত্র।

জল্লাদ এরশাদুর রহমান

এরশাদুর রহমান, পেশায় ছিলেন ডাকাত। দণ্ডিত হয়ে কারাগারে ছিলেন দীর্ঘদিন। '৭৭-এর অভ্যুত্থানের সময় তিনি ছিলেন কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কারা কর্তৃপক্ষ তার সাহসিকতার কথা জেনে তাকে জল্লাদ হিসেবে নিয়োগ দেয়। তার হাতেই ফাঁসি কার্যকর হয় ৯৩ জন সৈনিকের। জল্লাদ এরশাদের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় মাসিক একুশে পত্রিকায়, ২০০৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। পত্রিকাটির সম্পাদক আজাদ রহমান তার সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রীয় আয়োজনে ফাঁসিতে মারা কী আর কঠিন কাজ

নথিপত্র ঘেঁটে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফাঁসি কার্যকর হওয়া ৭২ জনের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হলেও ওই কারাগারের তৎকালীন প্রধান জল্লাদ এরশাদুর রহমান দাবি করেছেন, তার হাতে '৭৭-এর অভ্যুত্থানের ঘটনায় ৯৩ জনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে।

এরশাদুর রহমান সত্তরের দশকের শেষ দিকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের জল্লাদ ছিলেন। একটি ডাকাতির মামলায় সাত বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল তার। গ্রেপ্তার হওয়ার পর কিছুদিন চট্টগ্রাম কারাগারে ছিলেন। এরপর কুমিল্লা কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। কারাগারে প্রথমে নৈশপ্রহরী ও পরে সিওডিতে (কারারক্ষীদের আগমন ও প্রস্থানের সময় দেহ তল্লাশি করা) কাজ পান। বিশ্বস্ততা ও সাহসের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় তাকে কারা কর্তৃপক্ষ জল্লাদের কাজ করার প্রস্তাব দিলে রাজি হন তিনি। জল্লাদ এরশাদ জানান, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি ৯৩ জনের ফাঁসি কার্যকর করেছেন। ওই সময়গুলোতে এমনও হয়েছে যে এক রাতে ১২ জনের ফাঁসি কার্যকর করতে হয়েছে। তিনি আরো জানান, রাত ৮টা থেকে ভোর রাত পর্যন্ত তাকে ফাঁসির দড়ি টানতে হয়েছে। জল্লাদ এরশাদ '৭৭-এর অভ্যুত্থানের ঘটনায়ই শুধু নয়, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে যে অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করা হয় সেই ঘটনায় সামরিক ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের তিনজনের ফাঁসিও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে তার হাতে কার্যকর হয়েছে। একজন জল্লাদের হাতে ৯৬ জন মানুষের ফাঁসি কার্যকর করার ঘটনা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। আর এই নজিরবিহীন কাজটি করতে তার বিন্দুমাত্র সমস্যা হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রীয় আয়োজনে ফাঁসিতে মারা কী আর কঠিন কাজ।' সুচারুভাবে এই দায়িত্ব পালন করায় কারা কর্তৃপক্ষ তাঁর সাজার মেয়াদ দুই বছর কমিয়ে দেয়। পাঁচ বছর সাজা খাটার পর তিনি মুক্ত হয়ে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার পাহাড়ি এলাকার ত্রিপুরা সুন্দরী গ্রামে বাস করছেন।

অনেকেই জানতেন না

১৯৭৭-এর অভ্যুত্থান ও গণফাঁসি সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো প্রকাশের পর অগণিত স্বজনহারা ব্যক্তি ভোরের কাগজ ও আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখেন। যাদের অনেকেই এর আগ পর্যন্ত তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কারণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়েছিল, হয় তারা নিখোঁজ নয়তো পালিয়ে গেছে। কিংবা চাকরিচ্যুত করা হয়েছে অথবা কারো জেল হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেদনগুলো প্রকাশের পর তারা নিশ্চিত হয়েছিল তাদের স্বজনদের আসলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কিছু তারিখ উল্লেখ করার পর তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এরপর থেকে ঐ দিন নিজের স্বজনের মৃত্যুবার্ষিকী পালন শুরু করে। সরকারিভাবে যেটা জানানো উচিত ছিল '৭৭-এ, সেটা করা হয়নি।

এমনই এক শোকাহত ব্যক্তি মোহাম্মদ জিয়াউল কবির। চাকরি ছিল প্রধান সহকারী, কর বিভাগ, রেঞ্জ-১, বয়রা, খুলনা ও সভাপতি, বাংলাদেশ ট্যাক্সেস (৩য়) শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন, কর অঞ্চল, খুলনা। এক চিঠিতে তিনি তুলে ধরেন তার প্রতিক্রিয়া। তিনি তার ভাইকে হারিয়েছিলেন। ভাষাগত সংশোধনের পর তার চিঠিটির রূপটি দাঁড়ায় এ রকম...।

অকালমৃত্যু হলো বাবা মায়ের– শোকাহত ভাইয়ের চিঠি

'ভোরের কাগজ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত '৭৭-এর রহস্যময় সৈনিকদের গণফাঁসি' শিরোনামে তথ্যানুসন্ধানী লেখার প্রয়াসকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। অনেক বছর ধরে সহোদর হারানোর বেদনা; পরিণামে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আমার পিতা-মাতার অকালমৃত্যুজনিত শোকে মুহ্যমান অবস্থার মধ্যে হঠাৎ ভোরের কাগজে লেখা আমাকে চমকিত করেছে, অভিভূত করেছে। যে কথা এত বছর বলতে পারেনি, কেউ শুনতে চায়নি, আজ আপনাদের দৃঢ় প্রত্যয়ে তা প্রকাশের এ উদ্যোগ আমাকে, আমার পরিবারবর্গকে আশান্বিত করেছে।

আমার পিতা ছিলেন একজন চাকরিজীবী। সংসারে আমরা ছিলাম নয় ভাই (আমি বড়) এবং এক বোন। পিতার চতুর্থ সন্তান মো. ইকবাল কবির পিন্টু ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর এমওডিসি পদে যোগদান করে, বিডি নং-৫০০৬৪১। ১৯৭৭ সালে অনাকাঙ্ক্ষিত তথাকথিত সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনায় সে নিখোঁজ হয়। আমরা আর কোনো দিন তার খোঁজ পাইনি। আমাদের মাঝে সে আর ফিরে আসেনি। অনেক চেষ্টা করেছি সঠিক তথ্যানুসন্ধানের। কিভাবে এবং কেন আমার ভাইটি আর কখনো ফিরে এলো না

এ কথা জানতে। আমার আব্বা পুত্রের নিখোঁজের কারণ জানার জন্য কত আকুতি করেছেন, কোনো ফল হয়নি। সঠিক কোনো তথ্য আমার পরিবারবর্গকে এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেনি।

খুবই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শুধু পুত্রশোকে বাকহীন হয়ে আমার আব্বা মারা গেলেন (৪.৬.৭৮)। তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পড়লো আমার মায়ের ওপর। তিনিও পুত্র ও স্বামীর অকালমৃত্যুতে আমাদের মায়া ত্যাগ করলেন।

আমাদের সহোদর ইকবাল কবির পিন্টু চাকরিরত অবস্থায় নিখোঁজ হওয়ার পর বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে সঠিক কোনো তথ্য আমাদের সরবরাহ করা হয়নি। তবে ১৯৭৮ সালের ৩ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট কমান্ডিং অফিসারের পক্ষ থেকে একটি চিঠি আব্বাকে লেখা হয়, যার বক্তব্য ছিল ইকবাল কবিরকে সামরিক আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে কয়েদ করা হয়েছে। চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে এ-সংক্রান্ত পরবর্তী কোনো অগ্রগতি বা সংবাদ পরে প্রয়োজনে আমাদের জানানো হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা তদানীন্তন সরকার এ-সংক্রান্ত আর কোনো সংবাদ আমাদের জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

সহোদর ইকবাল কবিরের খোঁজে তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি নিজে দেখা করতে গেলে আমাকে আমার ভাইয়ের পক্ষে একটি কাগজে ১৮-৯-৭৮ ইং তারিখে স্বাক্ষর করিয়ে ২৮২ টাকা, একটি হাতঘড়ি, একটি চাবির ব্যাগ বুঝে পাওয়ার রসিদে সহি সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু আমার ভাইয়ের কোনো তথ্যাদি আমাকে জানানো হয়নি।

পরিশেষে আমার আব্বাকে তার পুত্র ইকবাল কবির পিন্টুর ব্যাপারে আর একটি পত্র লেখা হয়, (উক্ত চিঠি পাওয়ার আগেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন) যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইকবাল কবিরের বিভাগীয় দেনা-পাওনা সংক্রান্ত চূড়ান্ত হিসাব চুকানোর বিষয়ে নিয়মনীতি প্রতিপালনের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে আর কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

সবশেষে আমার পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা প্রশ্ন ও ব্যথা আপনার কাছে পেশ করে সান্ত্বনা পেতে চাই। আমার ভাইয়ের মতো অনেক যুবকের অজানা অপমৃত্যুর খবর এতদিন পর হলেও প্রকাশিত হলো। জানা গেলো যে আমার ভাইটির অন্তর্ধানের ফলে আমার আব্বা-আম্মার অকালমৃত্যু হয়েছে। এখন হয়তো শান্তি পাবে তাদের অতৃপ্ত আত্মা।

ব্রিটিশ এ দেশ শাসন করেছে, পাকিস্তানিরাও করেছে। আজ তারা এ দেশ শাসন করে না। আজ আমরাই আমাদের দেশ শাসন করছি। আমাদেরই সন্তানরা দেশমাতৃকার প্রতিরক্ষার্থে নিজের জীবনকে তুচ্ছ ভেবে যে মহান পেশায় গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আত্মাহুতি দিলো, কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্বর কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে সঠিক সংবাদটুকু পর্যন্ত আমাদের জানালো না। এ কেমন আচার? এ কেমন রীতি? সবার বিবেকের কাছে, জাতির কাছে এ প্রশ্ন রাখছি।

২৪৭ জনের শাস্তির খবর ছাড়া আর কোনো তথ্য নেই —বিমান সদর দপ্তর

১৯৯৫ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে লেখক আনুষ্ঠানিকভাবে বিমানবাহিনীর কাছে '৭৭-এর অভ্যুত্থান-পরবর্তী বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। প্রতিবার তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনো দালিলিক তথ্য-প্রমাণ নেই। তবে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বিমানবাহিনীর এমন উচ্চপর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা অনানুষ্ঠানিকভাবে নানা তথ্য দিয়েছেন। ২০০০ সালে প্রথমবারের মতো সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে ভাসা ভাসা কিছু তথ্য বিমানবাহিনী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয়। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী '৭৭-এর অভ্যুত্থানের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডসহ ২৪৭ জনকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কোনো তথ্য বিমান সদর দপ্তরে নেই। যদিও এর আগে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের সময় ১৯৮৭ সালে খোদ বিমানবাহিনী থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস শীর্ষক যে বইটিতে বলা হয়েছে ৫৮১ জন সদস্যকে বিমানবাহিনীকে হারাতে হয়েছে। বইটি নিষিদ্ধ করে সব কপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অভ্যুত্থান-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করায়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের সরকারের শেষদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকগুলোতে ১৯৭৭ সালে সংঘটিত অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিরক্ষা বাহিনীর অসহযোগিতায় সেই আলোচনা বেশিদূর এগোতে পারেনি। তখন স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ। যাকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে জেনারেল জিয়াকে সেনাপ্রধান করা হয়েছিল।

২০০০ সালের ২ অক্টোবর স্থায়ী কমিটির ২৬তম বৈঠকে প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছিলেন, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর ৪০০-৫০০ সদস্যকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বরের ৪ তারিখ কমিটির ২৭তম বৈঠকে ১৯৭৭ সালে সংঘটিত ঘটনা নিয়ে আলোচনা হয়।

২৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, কমিটির সভাপতি আওয়ামী লীগের সাংসদ মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ ২ অক্টোবর '৭৭ সালের ঘটনার সঙ্গে সেনা ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের বিচারকার্যের ওপর আলোচনার আহ্বান জানালে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান জানান, আলোচ্য সময়ে ঢাকা, বগুড়া ও অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সেনাপ্রধান কর্তৃক কোর্ট অব ইনকোয়ারি করা হয়। ইনকোয়ারির পর একাধিক মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে জড়িত ব্যক্তিদের

বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কতিপয় দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বৈঠকে বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমেদ জানান, যেসব বিমানবাহিনীর সদস্য বিদ্রোহে জড়িত ছিলেন, তাদের বেশির ভাগই মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে এবং কিছু বিমানবাহিনীর ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়েছিল। বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ৩১৬ জন বিমান সদস্যের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডসহ ২৪৭ জনকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করা হয় এবং ৬৯ জনকে ট্রাইব্যুনাল খালাস প্রদান করে। পরবর্তী সময়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এদের মধ্যে দুজনকে ছাড়া ৬৭ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এই তথ্যগুলো ছাড়া আর কোনো তথ্য বিমান সদর দপ্তরে নেই।

বৈঠকে স্থায়ী কমিটির সদস্য আওয়ামী লীগের সাংসদ কর্নেল শওকত আলী জেনারেল আতিক কর্তৃক পরিচালিত বিচারকার্যের মধ্যে বিমানবাহিনী অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা এবং মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনাল, না মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল ছিল জানতে চাইলে বিমানবাহিনীর জাজ অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, এগুলো মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনাল ছিল। শুধু ৩১ নম্বর মার্শাল ল' কোর্ট বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিমানসেনাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বিমানসেনাদের ও এমওডিসিদের দুটি ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়েছিল। যেসব বিমানসেনাকে আর্মি উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বিচার হয়েছে আর্মি মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালে। আর বিমানবাহিনীর তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাদের বিচার হয়েছিল বিমানবাহিনী মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালে।

কমিটির সদস্য বিএনপির সাংসদ মেজর মো. আখতারুজ্জামান বৈঠকে প্রশ্ন তুলেন, যখন মার্শাল ল' কোর্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে খালাস প্রদান করে তখন তার বিরুদ্ধে পুনরায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা? জবাবে বিমানবাহিনী প্রধান জানান, ট্রাইব্যুনালে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার এখতিয়ার আছে। সুতরাং আলোচ্য বিষয়টি আইনসঙ্গত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

বৈঠকে ১৯৭৭ সালে সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের বিচারকার্যের সমুদয় তথ্য দেওয়ার জন্য ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ সালের পরবর্তী বৈঠকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পরবর্তী বৈঠকটি হয়েছিল ৭ জানুয়ারি ২০০১ সালে। ওই বৈঠকে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়নি।

দশম সংসদেও গত ১৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে সরকারি দলের সংসদ সদস্য আ স ম জাহাঙ্গীর হোসেইন জানতে চেয়েছিলেন, জিয়ার আমলে সামরিক বাহিনীতে কয়টি অভ্যুত্থান হয়েছিল ও কতজন নিহত হয়েছিল। জবাবে সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী লিখিতভাবে জানান, ঐ সময় সরকার বা সংসদ ছিল না। জবাবদিহিতাও ছিল না। এ কারণে যারা ঘটনার শিকার হয়েছেন তাদের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। অর্থাৎ সরকার প্রকারান্তরে সেনা অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে রাজি নয়।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনী থেকে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস'। এ বইতে '৭৭-এর ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা রয়েছে। সেই বর্ণনায় ঐ দিনটি অভিহিত হয়েছে 'কালো দিন' হিসেবে। বইটি প্রকাশ করার পর '৭৭-এর অভ্যুত্থান নিয়ে কিছু মন্তব্য থাকায় তৎকালীন সামরিক সরকার সেটির সব কপি পুড়িয়ে ফেলে। তার মধ্যেও কিছু কপি থেকে যায়। সেই বইটি সরকারের একমাত্র প্রকাশিত নথি, যাতে বলা হয়েছে ঐ অভ্যুত্থানে ৫৬১ জন বিমানসেনাকে হারাতে হয়েছে।

বিমানবাহিনীর কালো দিন

২৮ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনী দিবসে পুরাতন বিমানবন্দরের কাছাকাছি বিমানবাহিনী অফিসার্স মেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা। সামরিক বাহিনীর সব পদস্থ কর্মকর্তাও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট জিয়া বিমানবাহিনী প্রধান এভিএম এ জি মাহমুদকে এক চিঠিতে জানালেন যে তার পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। এ সময় আরো দুটি ঘটনার ফলে অনুষ্ঠান অজান্তেই বন্ধ হয়ে গেলো।

২৬ সেপ্টেম্বর একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় স্কোয়াড্রন লিডার ইসলামসহ আরো দুজন ক্রু মারা গেলেন। জাপানি রেড আর্মির 'হিদাকা কমান্ডো ইউনিটের' পাঁচ সদস্য ১৫৬ জন যাত্রীসহ জাপান এয়ারলাইন্সের একটি ডিসি-৮ বিমান ব্যাংককের পথে বোম্বে ত্যাগ করার পরপরই হাইজ্যাক করে ঢাকায় অবতরণ করাতে বাধ্য করলো। ঢাকায় এ নিয়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গেলো। বিমানবাহিনী প্রধান এ জি মাহমুদকে বিমান ছিনতাকারীদের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব প্রদান করা হলো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হলো।

অনুষ্ঠান স্থগিত হলে তথাকথিত ২৮ সেপ্টেম্বরের ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো। দুদিন পর বগুড়া সেনানিবাসের একটি রেজিমেন্টের সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এতে দুজন কর্মকর্তা প্রাণ হারান। পরদিন ১ অক্টোবর ঢাকা সেনানিবাসেও উত্তেজনা দেখা দিলো। এখানে একটি ব্যাটালিয়নের কিছু বিপথগামী সৈন্য বিদ্রোহের আয়োজন করলো। এদের সঙ্গে কিছু বিমানসেনাও অস্ত্র ভাণ্ডার লুট করে বিদ্রোহে যোগ দিলো। ১ অক্টোবর দিবাগত রাতে সেনা ও বিমানবাহিনীর বিমানসেনারা ২৫টি ট্রাক ও জিপ নিয়ে সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডিপোতে হানা দিলো। ২ অক্টোবর ভোর ৫টায় সাতটি

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর সকালে তেজগাঁও বিমানবন্দরের হ্যাঙ্গারের সামনের দৃশ্য : একদিকে লাশ, আরেকদিকে অস্ত্রহাতে সৈনিকদের জটলা

ট্রাকে সৈন্য ও বিমানসেনারা রেডিও স্টেশন দখল এবং সেখানে তারা সিপাহি বিপ্লবে যোগ দেওয়ার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান জানালো। একজন বিমানসেনা (সার্জেন্ট আফসার) নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে বেতারে বক্তৃতা দিলেন। অবশ্য পুরো দেশ সে বক্তৃতা শোনার পূর্বেই নবম ডিভিশন হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে সাভারের ট্রান্সমিশন কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইতোমধ্যে বিদ্রোহ নৃশংস আকার ধারণ করলো। বিদ্রোহীরা বিমানবন্দর হ্যাঙ্গারের সামনে বিমানবাহিনীর দুজন অফিসারকে গুলি করে হত্যা করলো। বিমানবাহিনী প্রধানের সামনেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন রাস মাসুদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিমানবাহিনী প্রধান কোনোভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সেখানে গ্রুপ ক্যাপ্টেন আনসার আহমদ চৌধুরী, উইং কমান্ডার আনোয়ার শেখ, স্কোয়াড্রন লিডার এ মতিন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শওকত জাহান চৌধুরী, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সালাউদ্দিন, ফ্লাইং অফিসার মাহবুবুল হক, ফ্লাইং অফিসার আখতারুজ্জামান, পাইলট অফিসার এম এইচ আনসার, পাইলট অফিসার নজরুল ইসলাম ও পাইলট অফিসার শরিফুল ইসলামকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীদের গুলিতে স্কোয়াড্রন লিডার সিরাজুল হকের ১৬ বছরের তরুণ ছেলে এনামও নিহত হয়।

কিন্তু এ বিদ্রোহ বেশি দূর এগোতে পারেনি। কেননা বিদ্রোহের নায়করা অন্যান্য ইউনিট থেকে সৈন্যদের তাদের দলে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়। অবিলম্বে দেশপ্রেমিক অনুগত সৈন্যদের সহায়তায় বিদ্রোহ দমন করা হলো। কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করার অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। তখন ধারণা করা হয়েছিল যে জাপানি বিমান হাইজ্যাকের সঙ্গে বিমানবাহিনীর এ বিদ্রোহের যোগসূত্র ছিল।

বিদ্রোহের অপরাধে সরকার অপরাধীদের প্রতি কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। সরকার নির্দেশিত বিশেষ সামরিক আদালতে বিচারে এবং পরবর্তী সময়ে রুল ৩১ মোতাবেক যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে মোট প্রায় ৫৬১ জন বিমানসেনাকে বিমানবাহিনীকে হারাতে হয়েছিল, যা এ ক্ষুদ্র ও নবীন বিমানবাহিনীর জন্য এক অতি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওই বিচারে বেশ কিছুসংখ্যক বিমানবাহিনী এএমও ডিসিও বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ঐ দিনের ঘটনা ছিল সারা দেশের, তথা সশস্ত্র বাহিনী ও বিমানবাহিনীর জন্য একটি 'কালো দিন'। আমরা প্রার্থনা করি এর যেন পুনরাবৃত্তি না হয়।

অভ্যুত্থানের শিকার তিন সৈনিকের লাশ পড়ে আছে তেজগাঁও বিমানবন্দরে
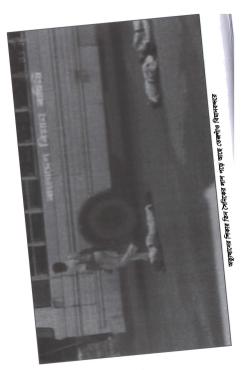
শেষের আগে

বঙ্গবন্ধু ও জিয়ার হত্যাকাণ্ডের বাইরে সামরিক বাহিনীতে ছোট-বড় ২১টি অভ্যুত্থানের খবর আমরা বিভিন্ন গবেষক ও সামরিক বিশ্লেষকদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এর মধ্যে ১৯টিই ছিল জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে। জিয়া এসব অভ্যুত্থান অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করেন। আর এ কারণে স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সামরিক বাহিনীর অনেক চৌকস-মেধাবী ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এবং হাজারো সৈনিককে অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে কখনই বিশ্লেষণ করা হয়নি কেন এত বিদ্রোহ। ঘটনার গভীরে যাওয়া হয়নি– কেন এত রক্তক্ষয়? আর শেষ পর্যন্ত সেই রক্তস্রোত, যার প্রবাহ জেনারেল জিয়া নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে নিজের রক্ত দিয়ে সেই স্রোতের গতিরোধ করতে হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকেই সামরিক বাহিনীতে মত ও দর্শনের বিভক্তি ছিল। পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা অফিসাররা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আদলেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠনের পক্ষে ছিলেন, অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের আগ্রহ ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাহিনীকে গড়ে তোলা; কেউ কেউ উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনী গঠনের স্বপ্ন দেখছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা কেমন হবে– একপর্যায়ে এ নিয়ে মতবিরোধ প্রায় প্রকাশ্য হয়ে পড়েছিল। উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনী গঠনের পক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন কর্নেল তাহের। তিনি গোপনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে (জাসদ) যোগ দেন এবং সেনাবাহিনীর ভেতরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই দুই পক্ষের মধ্যকার দ্বন্দ্বের জের ধরে সেনাবাহিনীতে বেশ কটি অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া সেনাবাহিনীতে কোনো এলিট ক্লাস থাকবে না এমনটিও আশা করছিলেন অনেক সিনিয়র অফিসার। তারা সৈনিকদের একটা বড়

অংশকে এ ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধও করতে পেরেছিলেন। শুরুতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব-গ্রুপিং থেকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ থেকে ব্যাপক রক্তক্ষয় সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

অনেক বিশ্লেষক ও গবেষক এ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরো অনেক পেছনে গিয়ে বলেছেন, এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি মূলত ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার সেনাবাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটিশরা ইন্ডিয়ায় সেনাবাহিনী গঠন করে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি বাস্তবায়নের জন্য। তারা সেনাবাহিনীকে শিক্ষাই দিতো এমনভাবে, যাতে জনগণ কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। রাজনীতিবিদরা দেশের শত্রু, জনগণ মূর্খ আর সামরিক অফিসাররা এলিট— এ ধারণা তাদের দেওয়া হতো।

পাক-ভারত বিভক্তির পর ভারত সরকার তাদের সেনাবাহিনী গঠনে ব্রিটিশদের ঐ নীতি পরিহার করে এবং সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণে ব্যাপক সংস্কার আনে, সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনা হয়। তাই এখন পর্যন্ত সেখানে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে কোনো ভূমিকা রাখেনি। অপরদিকে পাকিস্তান ব্রিটিশদের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে। তারা পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি, এয়ারফোর্স একাডেমি ব্রিটিশ আদলেই গঠন করে, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণনীতি বহাল রাখে— তাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। সত্তরের দশকে যেসব সেনা কর্মকর্তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভূমিকা রেখেছেন, তারা ষাটের দশকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

এরই মধ্যে ঘটে যায় '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। একটি নিয়মিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে নিয়োজিত ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ছাত্র-যুবক-কৃষক এবং শ্রমিকদের ট্রেনিং দিয়ে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয়। যাদের অনেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নিয়মিত বাহিনীর অংশ হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর এই অংশটি ছিল রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় অনেকটা অগ্রসর।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সরকার একটি আধুনিক ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়নি। তার সরকার অনেকটা অবহেলাই করেছে সেনাবাহিনীকে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, সেনাবাহিনীর প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটা ভীতি ছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মুজিব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। বেশির ভাগ সময়ই কারাবন্দি থাকতে হয়েছে। পাক সামরিক জান্তারা তাঁর ও তাঁর দলের ওপর যে অত্যাচার করেছে সেটির পুনরাবৃত্তি যেন না হয় তাই তিনি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে মনোযোগী হননি। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের সিনিয়রিটি দেওয়ায় পাকিস্তান থেকে ফেরত আসা অফিসাররাও তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। অপরদিকে সেনাবাহিনীর যে ক্ষুদ্র অংশটি উৎপাদনমুখী সেনাবাহিনী

গঠনের পক্ষে ছিল তারাও বঙ্গবন্ধু সরকারের ওপর নাখোশ ছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেনাবাহিনীর ঐ দুটি গ্রুপই মনে করে তারা নিজ নিজ চিন্তা-চেতনার বাস্তবায়ন করতে পারবে। পাকিস্তান-ফেরত অফিসাররা ভাবেন তারা এলিট হিসেবে সুপ্রিমেসি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবেন। আর উৎপাদনমুখী ও বৈষম্যহীন সেনাবাহিনী যারা গড়তে চেয়েছিলেন অর্থাৎ তাহের ও তার অনুসারীরা ভাবেন জেনারেল জিয়াকে দিয়েই তারা তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করে নিতে পারবেন। এই চিন্তা-চেতনা থেকেই কর্নেল তাহের ও তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সহায়তা করে জেনারেল জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে আনেন। কিন্তু সপ্তাহ না যেতেই তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জিয়া তাহের ও তার অনুসারী জাসদ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করেন। পাশাপাশি জিয়া পাকিস্তান-ফেরত অফিসারদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া শুরু করেন।

'৭৬-এর জুলাইয়ে গোপন সামরিক ট্রাইব্যুনালে ফাঁসিতে তাহেরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। গোপন ট্রাইব্যুনালে তাহেরের আইনজীবী সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের দেওয়া একটি উক্তি তাদের মনে গেঁথে যায়। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'রাজা যদি বিনা অপরাধে প্রজাকে হত্যা করেন, তবে রাজা এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে প্রজাও রাজাকে হত্যা করতে পারে।' ভাগ্যের এই বুঝি নির্মম পরিহাস– যে সিপাহিরা জেনারেল জিয়াকে ৭ নভেম্বর বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল, ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছিল, তারাই পরবর্তী পর্যায়ে বারবার তাকে হত্যার চেষ্টা চালাতে থাকে।

তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে জিয়া ক্ষান্ত হননি। তিনি একে একে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দূরে ঠেলে দিচ্ছিলেন। পাকিস্তান-ফেরত অফিসাররা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৭৫ সালে সামরিক বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার। এর মধ্যে ৩০ হাজার সদস্যের সেনাবাহিনী, ৫ হাজার ৫৫০ সদস্যের বিমানবাহিনী ও ৫৫০ সদস্যের নৌবাহিনী। এই ৩৬ হাজারের মধ্যে ২৮ হাজারই ছিল পাকিস্তান-ফেরত যার মধ্যে হাজার খানেক ছিলেন অফিসার পদবির। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বঙ্গবন্ধু সরকার দুই বছর সিনিয়রিটি দেওয়ায় পাকিস্তান-ফেরত অফিসারদের সঙ্গে রেষারেষি লেগেই ছিল। জিয়া পাকিস্তান-ফেরতদের পক্ষ নেওয়ায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা অফিসার অসন্তুষ্ট ছিলেন। আর ভেতরে ভেতরে জাসদ সমর্থিতরা তো জ্বলছিলেনই। অপরদিকে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর খুনিরা আরো ব্যাপক ক্ষমতা না পাওয়ায় তারাও ক্ষুব্ধ ছিলেন।

৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থান যেটাকে অনেকেই 'সিপাহি বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন সেই একই আদলে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কিছু সদস্য জিয়াকে হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই ১৯৭৭ সালে ২ অক্টোবরের সেই ব্যর্থ অভ্যুত্থানকে অনেক সামরিক বিশ্লেষক 'দ্বিতীয়

সিপাহি বিপ্লব' বলে থাকেন। কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব, নিখুঁত পরিকল্পনা ও বাস্তবতা পারঙ্গমে অক্ষমতার কারণে সেই অভ্যুত্থান সফল হতে পারেনি। সেদিন কোনো অফিসার ঐ অভ্যুত্থানে যোগ দেননি। সিপাহিরা অফিসার হত্যা শুরু করে। এতে যোগ দেয় মূলত বিমানবাহিনীর সদস্যরা।

জেনারেল জিয়া কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দিয়ে যেভাবে অভ্যুত্থানকারীদের দমন করেছিলেন, একইভাবে অক্টোবরের অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রেও গণহারে বহুজনকে অভিযুক্ত করে কলমের এক খোঁচায় শত শত সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এতে অনেক নিরপরাধ সৈনিককেও প্রাণ হারাতে হয়েছিল। বিমানসেনারা কেন বিদ্রোহ করলো– এর মূলে তিনি যেতে চাননি। কারণগুলো খুঁজে বের করে তা সমাধানের চিন্তা না করে মুক্তিযুদ্ধের সময় জন্ম নেওয়া ছোট্ট বিমানবাহিনীকেই একসময় বিলুপ্ত করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। লে. জে. মীর শওকত আলী আমাকে জানিয়েছেন, জেনারেল জিয়া বিমানবাহিনী বিলুপ্ত করে এর জনবল ও সম্পদ আর্মি এভিয়েশন কোরের অধীনে নিয়ে আসার চিন্তা করেছিলেন। প্রায় দুই মাস তাই বিমানবাহিনীর কোনো কার্যক্রম ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত জিয়া তার চিন্তা থেকে সরে এসেছিলেন।

বিমানবাহিনী বিলুপ্ত না করলেও তার মধ্যে 'বিমানবাহিনী ভয়' ঢুকে গিয়েছিল– আর তাই শত শত বিমানসেনাকে ফাঁসিতে হত্যা করা হয় কোনোরকম তদন্ত ছাড়াই। তাদের বেদনার কথা শুনতে চাননি তিনি। মৃত্যুদণ্ডকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন প্রতিষেধক হিসেবে। এ কথার প্রমাণ মেলে তথাকথিত ট্রাইব্যুনাল গঠন ও লোক দেখানো তদন্ত কমিশন গঠনে। আর সেনা সদর দপ্তর যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল তাকে বিমানবাহিনীর সদস্যদের বিদ্রোহ নিয়ে কোনোরকম তদন্ত করার ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন তৎকালীন লে. কর্নেল চৌধুরী খালেকুজ্জামান। তিনি তার 'সামরিক জীবনের স্মৃতি ১৯৬৪-১৯৮১' বইতে লিখেছেন, '১৯৭৭ সালে একই সঙ্গে বগুড়া ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ঢাকায় তখন কিছু অফিসার হতাহত হয়। ... সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার থেকে এসব ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিকে একটা ব্যবস্থা সুপারিশ করার জন্য বলা হয়। বিমানবাহিনীর বিদ্রোহ নিয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা কমিটিকে দেওয়া হয়নি।'

অক্টোবরের এই অভ্যুত্থান দমনে কেন জেনারেল জিয়া এত হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব পাওয়া না গেলেও ধারণা করা যায়, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এর পরিণতি কী হতে পারে। ৭ নভেম্বর 'সিপাহি বিপ্লব'-এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় বসা জিয়া বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে বিদ্রোহী সৈনিকরা একে একে সব অফিসারকে হত্যার চেষ্টা চালাবে। তাই তিনি একমুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাননি। অতি দ্রুত বিদ্রোহীদের ফাঁসিতে বা ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যার নির্দেশ দেন। আর এর পেছনে তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন পাকিস্তান-ফেরত অফিসাররা। জিয়ার মধ্যে এমন

ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা হয়তো দূর থেকে এ অভ্যুত্থানে ইন্ধন জুগিয়েছে।

অর্থাৎ অক্টোবর অভ্যুত্থানের পুরো ঘটনা জিয়াকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। জিয়া সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে বড় ধরনের রদবদল আনেন। সেনাপ্রধানের পদটির সম্ভাব্য দাবিদার নবম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে যশোর ও সিজিএস মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে তিনি অতি দ্রুত চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন। বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীরকে অব্যাহতি দিয়ে বিদেশে কূটনীতিকের চাকরি দিয়ে পাঠিয়ে দেন। ডিজিএফআই প্রধান আমিনুল ইসলামকেও অব্যাহতি দেন। উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটিও তিনি বিলুপ্ত করেন। সামরিক বাহিনীতে এই রদবদল থেকে বোঝা যায় জিয়া নিজ বাহিনীতে নিরাপদ বোধ করছিলেন না। আর তখনই তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তটি ত্বরান্বিত করেন। তিনি অনুধাবন করতে শুরু করেন যে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকের মধ্যেই ব্যস্ত রাখতে হবে। নিজেকে জনগণের কাতারে নামাতে হবে। তাই জিয়া সব অফিসারকে নির্দেশ দেন তাকে মেজর জেনারেল জিয়া হিসেবে সম্বোধন না করে প্রেসিডেন্ট জিয়া হিসেবে সম্বোধন করতে। পাশাপাশি তিনি অতি দ্রুত রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। '৭৭-এর ১৬ ডিসেম্বর জিয়া ঘোষণা করেন শিগগিরই তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করবেন, যার ভিত্তি হবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। সেই ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় আজকের বিএনপি।

সামরিক বাহিনীতেও তার কোনো বিরুদ্ধাচরণ যেন না থাকে সে কারণেই জিয়া তদন্ত ছাড়াই সৈনিকদের হত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর তাই সামরিক আইন বলে যেসব ট্রাইব্যুনাল তিনি করেছিলেন, সেখানে অভিযুক্তদের কোনো ডিফেন্ডিং অফিসার দেওয়া যাবে না বলে ফরমান জারি করেন। আপিলের সুযোগ তো বন্ধই ছিল। একতরফা রায়ে দুই মিনিটেই একজন সিপাহির মৃত্যুদণ্ড ধার্য হয়ে যায়– হারিয়ে যায় শত শত সৈনিক। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে সময় লাগবে বলে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মৃত্যুর ফরমান জারি করা হয়।

তাই তো আজও আকবর-আলেয়ার ছেলে শরীফ বা মনিররা খুঁজে বেড়ায় তাদের বাবাকে। যিনি সব কিছু তুচ্ছজ্ঞান করে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। আর ঐ ছেলেটি যে জন্মের পর বাবাকে দেখতেই পায়নি, বাবার ছবি বুকে নিয়ে আজও স্বপ্ন দেখে কোনো একদিন হয়তো তার বাবার হত্যার বিচার হবেই। ইতিহাসের অন্ধকার সেই অধ্যায়টি উন্মোচিত হবেই। কিন্তু কবে? আর কত অপেক্ষা? বুকের ভেতর জমাটবাঁধা কান্নার অবসানের অপেক্ষা। এ অপেক্ষার পথ যে অনেক দীর্ঘ ...।

পরিশিষ্ট

ঢাকা, কুমিল্লা ও বগুড়া কারাগারে ২০৯ জনের ফাঁসি হয়

১৯৭৭-এর ২ অক্টোবর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ও তা দমনে সময় এবং পরবর্তী শাস্তি প্রক্রিয়ায় সেনা ও বিমানবাহিনীর মোট কতজন সদস্য নিহত হয়েছেন, তার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা ও তা কারাগারে কার্যকর করা সংক্রান্ত একটি তালিকা পাওয়া গেছে।

ঢাকা ও কুমিল্লা ঐ দুটি কারাগারে মোট ১৯৩ জনের ফাঁসি হয়। ঢাকায় ৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর '৭৭ পর্যন্ত এবং কুমিল্লায় ২৯ অক্টোবর '৭৭ থেকে জানুয়ারি '৭৮ পর্যন্ত ফাঁসিগুলো কার্যকর হয়। দেশের অন্য কারাগারগুলোতে ফাঁসি হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়। কিন্তু অন্য কোনো জেলে অক্টোবরের ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসি হওয়া সম্পর্কে কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অপরদিকে ঢাকায় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার প্রাক্কালে ৩০ সেপ্টেম্বর '৭৭ দিবাগত গভীর রাতে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে একটি রেজিমেন্টের সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছিল। পরে বিদ্রোহীদের মার্শাল ল' ট্রাইব্যুনালে বিচার হয়। ২৬ অক্টোবর '৭৭ আইএসপিআর-এর মাধ্যমে জানা যায়, ঐ ঘটনায় ৫৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। বগুড়া কারাগারে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ২১ ও ২২ অক্টোবর দুই রাতে বগুড়া কারাগারে ১৬ জনের ফাঁসি হয়। অপর ৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কোথায় কিভাবে করা হয়েছিল তা জানা যায়নি। তৎকালীন সামরিক সরকারও এসব তথ্য প্রকাশ করেনি।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ২১ দিনে ১২১ জনের ফাঁসি হয়

ক্রমিক	কয়েদি নং	নাম	ব্যাজ নং ও পদবি	সাজার তারিখ	ফাঁসির তারিখ
১।	৭১৩৮/এ	ছিদ্দিক আহমেদ	৮৪৮৬৪ এমডিসি	০৭-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
২।	৭১৩৯/এ	মহিউদ্দিন	৪৪০৭০৮MET Air Hq	০৭-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
৩।	৭১৪০/এ	আবুল হোসেন	৪৪০৭১৯ কর্পোরাল	০৭-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
৪।	৭১৪১/এ	আঃ হালিম	৮৩১৬৪ কর্পোরাল	০৭-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
৫।	৭১৪২/এ	তোফাজ্জল হোসেন	৭০৪৫ ১১Fd unit	০৭-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
৬।	৭১৪৩/এ	খোরশেদ আলম	৮৩১৬৪ কর্পোরাল	০৭-১০-৭৭	২৪-১০-৭৭
৭।	৭১৪৪/এ	দলিল উদ্দিন	৭০২৯৫৬৮ ১২৫ FDME	০৮-১০-৭৭	১২-১০-৭৭
৮।	৭১৪৫/এ	মোবারক আলী	৮৪১৫৪BAF.B.Sase	০৮-১০-৭৭	১২-১০-৭৭
৯।	৭১৪৬/এ	মোস্তাফিজার রহমান	৭৫৪১২ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	১১-১০-৭৭
১০।	৭১৪৭/এ	আঃ ছাত্তার	৭৫৪২৮	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১১।	৭১৪৯/এ	ইলিয়াছ হোসেন	৮৩৫৫৪ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১২।	৭১৫০/এ	আরজু শিকদার	৪৪০২০ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১৩।	৭১৫১/এ	আহসান উল্যা	৮২৫৪৭ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১৪।	৭১৫২/এ	আঃ জব্বার	৮৬৫২৬ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১৫।	৭১৫৩/এ	হামিদ	৮৩৫২৬ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১৬।	৭১৫৪/এ	আবুল খায়ের ভূইয়া	৭৯২৮৪ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১৭।	৭১৫৫/এ	রেজা মিয়া	৬৮৬২৩১০ সাপ্লাই/জিডি	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
১৮।	৭১৫৬/এ	এখলাছুল মোমেনিন	৬৫৮৭০৯৯ সিপাহি	০৮-১০-৭৭	১৯-১০-৭৭

১৯।	৭১৫৭/এ	আবু বকর ছিদ্দিক	৮৪৬৪৮ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
২০।	৭১৫৮/এ	আফাজউদ্দিন ভুইয়া	৭৬৮৫২ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১৮-১০-৭৭
২১।	৭১৫৯/এ	ইয়াকুব আলী	৬৮৯৪৩ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১১-১০-৭৭
২২।	৭১৬০/এ	ফরিদুর রহমান	৭৬৭৩৭ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	১১-১০-৭৭
২৩।	৭১৬১/এ	আঃ রশিদ	৭২৯৮০ ফ্লাইট সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	১১-১০-৭৭
২৪।	৭১৬২/এ	সায়েদ হোসেন	৪৪০৪৬৮ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১১-১০-৭৭
২৫।	৭১৬৩/এ	জহির আহম্মেদ	৪৪০২১৬ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	১১-১০-৭৭
২৬।	৭১৬৪/এ	মমিন উল্লাহ	৭২৯৮৭ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	১১-১০-৭৭
২৭।	৭১৮৯/এ	শফিকুর রহমান	৭০৩১০৩৪ ল্যান্স নায়েক বেজ ওয়ার্কশপ	০৮-১০-৭৭	০৯-১০-৭৭
২৮।	৭১৯০/এ	এম এ কুদ্দুস	৭০২৫৬২৫ ল্যান্স নায়েক বেজ ওয়ার্কশপ	০৮-১০-৭৭	০৯-১০-৭৭
২৯।	৭১৯১/এ	ফজলুল হক	B.J.o.NYA	০৮-১০-৭৭	০৯-১০-৭৭
৩০।	৭১৯২/এ	মহসীন রেজা	৬৫৮৯৫৪৭ সিপাহি/এমটি	০৮-১০-৭৭	০৯-১০-৭৭
৩১।	৭১৯৩/এ	শফিকুল ইসলাম	৬৮০৫২৬৯ সিপাহি/ডিএন্ডপি	০৯-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
৩২।	৭১৯৪/এ	মজিবুর রহমান	৬৮৬৪৭২৩ সিপাহি/ক্লার্ক	০৯-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
৩৩।	৭১৯৫/এ	আরশেদ আলী	৬৮৬২৬৩৬ সিপাহি/জিডি	০৯-১০-৭৭	১০-১০-৭৭
৩৪।	৭১৯৬/এ	বেলায়েত হোসেন	৫০০১০৮ সিপাহি ৪র্থ এমওডিসি	০৭-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭
৩৫।	৭১৯৭/এ	আলতাব উদ্দিন	৫০০৫২৭ সিপাহি	০৭-১০-৭৭	১২-১০-৭৭
৩৬।	৭১৯৮/এ	মোশারফ হোসেন	৬৮৬১৬৫২ ক্লার্ক, সিওডি	০৭-১০-৭৭	১২-১০-৭৭
৩৭।	৭১৯৯/এ	আঃ কুদ্দুস	৭০৫৭০১৫ নায়েক সিপাহি/ডিজি	০৭-১০-৭৭	১২-১০-৭৭
৩৮।	৭২০০/এ	শফিকুল ইসলাম	৫০০৫৩৯ সিপাহি/এমওডিসি	০৭-১০-৭৭	২৮-১০-৭৭
৩৯।	৭২০১/এ	আঃ মতিন	৬২৬০৭৮০ হাবিলদার, স্ট্রাডিক উইং	০৭-১০-৭৭	২৯-১০-৭৭
৪০।	৭১২০২/এ	আঃ হাই	৭০৪৯৩১৬ সিপাহি ২৬৩ আর্মি এসএন্ডটি	০৭-১০-৭৭	১৯-১০-৭৭
৪১।	৭১২০৩/এ	আঃ খালেক	৬৫৮১৮৫২ ল্যান্স নায়ক	০৭-১০-৭৭	১৯-১০-৭৭
৪২।	৭১২০৪/এ	নওয়াব আলী	৬৫৮৫৯১৩ সিপাহি আর্মি এসএন্ডি BN	০৭-১০-৭৭	১৯-১০-৭৭
৪৩।	৭১২০৫/এ	আমির আলী	৬৫৮৬৯১৭ সিপাহি	০৭-১০-৭৭	
৪৪।	৭১২০৬/এ	আঃ মান্নান	১০৩৩৪৯৩ সিপাহি	০৭-১০-৭৭	০৮-১০-৭৭
৪৫।	৭১২০৭/এ	আঃ করিম	১০৩৪০৪০ সিপাহি	০৭-১০-৭৭	১৯-১০-৭৭
৪৬।	৭১২০৮/এ	আবুল হাশেম	৬৪৫২৩১৪ সিপাহি	০৭-১০-৭৭	
৪৭।	৭১২০৯/এ	আ: বারেক ফকির	৬৫৫৮৪২৯ নায়েক সিওডি ঢাকা ক্যান্ট:	০৭-১০-৭৭	
৪৮।	৭১২১২/এ	বাদশা মিয়া	৬৮৬৪৩১৩ সিপাহি/জিডি	০৭-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৪৯।	৭১২১৩/এ	নিজাম উদ্দিন	৬৮৬৪৩৩৪ সিপাহি/জিডি	০৭-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৫০।	৭১২১৪/এ	জিয়াউল হক	৬৮৬১৫৫৫ সিপাহি/জিডি	০৭-১০-৭৭	২২-১০-৭৭
৫১।	৭১২১৫/এ	আলী আহাম্মদ	৬৮৬১৯৯৮ সিপাহি/জিডি	০৭-১০-৭৭	২২-১০-৭৭
৫২।	৭১২১৬/এ	মোজাম্মেল হক	৬৮০৫৩৪২ ল্যান্স নায়েক	০৭-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৫৩।	৭২১৭/এ	জাহাঙ্গীর আলম	৬৮৮৭০৮১ ইউ/এলএনকে	০৭-১০-৭৭	২২-১০-৭৭
৫৪।	৭২২৪/এ	আঃ রহমান	৭৪১৪৩ সার্জেন্ট	০৯-১০-৭৭	২৬-১০-৭৭
৫৫।	৭২২৫/এ	আমীন	৪৪০২৮৩	০৯-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৫৬।	৭২২৬/এ	এম এস মান্নান	৮৪৫৪২	০৯-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৫৭।	৭৩০১/এ	খন্দকার আতাউর রহমান	৫০০৫৭৩ সিপাহি/এমওডিসি	১১-১০-৭৭	১৫-১০-৭৭
৫৮।	৭৩০২/এ	আঃ হাই	৫০০৫৭৮ সিপহি/এমওডিসি	১১-১০-৭৭	১৫-১০-৭৭
৫৯।	৭৩০৩/এ	ফরহাদ মিয়া	৫০০০০৪২ নায়েক	১১-১০-৭৭	১৫-১০-৭৭
৬০।	৭৩০৬/এ	আঃ রব মিয়া	৫০০১০৯ ল্যান্স নায়েক	১২-১০-৭৭	১৫-১০-৭৭
৬১।	৭৩০৭/এ	শহিদুল্লাহ	৫০০৩০৩ সিপাহি/এমওডিসি	১২-১০-৭৭	১৫-১০-৭৭

৬২।	৭৩০৮/এ	ফরিদ মিয়া	৫০০২৪২ সিপাহি	১২-১০-৭৭	১৫-১০-৭৭
৬৩।	৭৩১৯/এ	সাহেব আলী	৫০০৩১১ ল্যান্স নায়েক/এমওডিসি	১৩-১০-৭৭	২২-১০-৭৭
৬৪।	৭৩২৮/এ	আফছার খান	৭৭০৫১ সার্জেন্ট	১৪-১০-৭৭	২২-১০-৭৭
৬৫।	৭৩২৯/এ	ফজলুল হক	৪৪০৯৪০ কর্পোরাল	১৭-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৬৬।	৭৩৩৭/এ	এ হাকিম	৮৩৮৮৮ কর্পোরাল	১৫-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৬৭।	৭৩৩৮/এ	আলতাছ	৪৪০৮৫৪ কর্পোরাল	১৫-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৬৮।	৭৩৩৯/এ	মোখলেছুর রহমান	৮৩৮৪৯ কর্পোরাল	১৫-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৬৯।	৭৩৪১/এ	মহিউদ্দিন	৪৪০৬৪৪ কর্পোরাল	১৫-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৭০।	৭৩৫০/এ	এনামুল হক	৬২৭৪০২৮ নায়েক	০৮-১০-৭৭	১৬-১০-৭৭
৭১।	৭৩৫১/এ	রণজিৎ কুমার বৈদ্য	৬২৮৭৭৬৪ সিগন্যাল	০৮-১০-৭৭	১৬-১০-৭৭
৭২।	৭৩৫২/এ	আবু খালেদ	৬২৮৫৫১৯ নায়েক	০৮-১০-৭৭	১৬-১০-৭৭
৭৩।	৭৩৫৩/এ	সামছুল হক	৬২৮৪৫৪১ সিগন্যাল এসজিএস	০৮-১০-৭৭	১৬-১০-৭৭
৭৪।	৭৩৫৪/এ	জাবেদ আলী	৬২৮৪৭০৬ সিগন্যাল ওআরকে	০৮-১০-৭৭	১৬-১০-৭৭
৭৫।	৭৩৫৫/এ	আঃ মান্নান	৬২৭১১৮৬ নায়েক টিটি	০৮-১০-৭৭	১৬-১০-৭৭
৭৬।	৭৩৫৬/এ	কাজী সাহেদ হোসেন	৬২৮৪৮৫৪ সিগন্যাল ও আরডাব্লিউ	০৮-১০-৭৭	১৬-১০-৭৭
৭৭।	৭৪১৪/এ	আজগর আলী	১৩৪১০০৭ সিপাহি	১০-১০-৭৭	২১-১০-৭৭
৭৮।	৭৪১৫/এ	আমীর আলী	৬৫৮৬৯১৭ সিপাহি এমটি	০৯-১০-৭৭	২১-১০-৭৭
৭৯।	৭৪১৭/এ	আঃ করিম	১০৩৪৩৪৪০ সিপাহি এমটি	০৯-১০-৭৭	২১-১০-৭৭
৮০।	৭৪১৮/এ	আবুল হাসেম	৬৪৫২৩১৪ সিপাহি কুক	০৯-১০-৭৭	২১-১০-৭৭
৮১।	৭৪১৯/এ	আঃ বাছেদ ফকির	৬৮৫৮৪২৯ নায়েক জিডি	০৯-১০-৭৭	২১-১০-৭৭
৮২।	৭৪২০/এ	গোলাম ফকির	৬৮৬২৬০০ সিপাহি জিডি	০৯-১০-৭৭	২১-১০-৭৭
৮৩।	৭৪২১/এ	আ: জব্বার	৬৮৬২০৮১ সিপাহি জিডি	০৯-১০-৭৭	২১-১০-৭৭
৮৪।	৭৪৭২/এ	মিনার কান্তি	৭২২২৮ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৮৫।	৭৪৭১/এ	আজিজুল হক	৮০৪৯৩ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৮৬।	৭৪৭৩/এ	আহমেদুল হক	সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৮৭।	৭৪৭৪/এ	মনির হোসেন	১৩৩৮৮৪ ল্যান্স নায়েক	০৮-১০-৭৭	২৩-১০-৭৭
৮৮।	৭৫১১/এ	মাহমুদুর রশিদ	৮২৫৬৮ কর্পোরাল	০৯-১০-৭৭	২৪-১০-৭৭
৮৯।	৭৫১২/এ	মোশারফ আলম	৭৬৯৫২ কর্পোরাল	০৯-১০-৭৭	২৪-১০-৭৭
৯০।	৭৫১৩/এ	আবুল বাশার	৭০২১ সার্জেন্ট	০৯-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৯১।	৭৫১৪/এ	সাইদুর রহমান	৭৭৪৫৯ সার্জেন্ট	০৯-১০-৭৭	২৫-১০-৭৭
৯২।	৭৫১৫/এ	মাইন উদ্দিন	৭৫৪১১ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	২৪-১০-৭৭
৯৩।	৭৫১৬/এ	মঞ্জুর আহম্মেদ	৮৩৫৫৯ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	২৪-১০-৭৭
৯৪।	৭৫১৭/এ	জয়নাল আবেদিন	৮২৫৪০ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	২৪-১০-৭৭
৯৫।	৭৫৪৩/এ	এ কালাম	৮৩৮৫৯ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	২৬-১০-৭৭
৯৬।	৭৫৪৪/এ	আমানত হোসেন	৫০০২০৪ নায়েক	১১-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭
৯৭।	৭৫৪৫/এ	ওয়াদুদ	৪৪০৬৯৪ কর্পোরাল	১১-১০-৭৭	২৬-১০-৭৭
৯৮।	৭৫৪৬/এ	মোয়াজ্জেম হোসেন	৬২৮৫৯০১ সিগন্যাল	১১-১০-৭৭	২৬-১০-৭৭
৯৯।	৭৫৪৭/এ	এস রহমান	৮০৭১৭ কর্পোরাল	১১-১০-৭৭	২৬-১০-৭৭
১০০।	৭৫৪৮/এ	জয়নাল আবেদিন	৭৬৪৮৮ সার্জেন্ট	০৮-১০-৭৭	২৬-১০-৭৭
১০১।	৭৫৪৯/এ	হাবিব	৮২১৯৯ কর্পোরাল	০৮-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭
১০২।	৭৫৫০/এ	আকবর	৪৪০০৬১ কর্পোরাল	১১-১০-৭৭	২৬-১০-৭৭
১০৩।	৭৬১৮/এ	মতিয়ার রহমান	৪৪০১৪০১	২৬-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭
১০৪।	৭৬১৯/এ	বারেক মিয়া	৫০০২৩৩৩ সিপাহি এমওডিসি	২৬-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭

১০৫।	৭৬২০/এ	মোবারক হোসেন	৮২৬০৯ কর্পোরাল	২৬-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭
১০৬।	৭৬২১/এ	আঃ জলিল	৫০০৬৮১ সিপাহি এমওডিসি	২৬-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭
১০৭।	৭৬২২/এ	জয়নাল আবেদিন	কর্পোরাল	২৬-১০-৭৭	২৮-১০-৭৭
১০৮।	৭৬২৩/এ	দেলোয়ার হোসেন	৫০০১৪৫ সিপাহি এমওডিসি	২৬-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭
১০৯।	৭৬২৪/এ	ইকবাল কবীর	৫০০৬৪১ সিপাহি এমওডিসি	২৬-১০-৭৭	২৭-১০-৭৭
১১০।	৭৬২৫/এ	আতাউর রহমান	৮২১৫৯ কর্পোরাল	২৬-১০-৭৭	২৮-১০-৭৭
১১১।	৭৭০২/এ	আঃ মজিদ	৬৫৮৯৫৫৬ সিপাহি	০৯-১০-৭৭	২৮-১০-৭৭
১১২।	৭৭০৩/এ	জাকারিয়া	৬৫৮৬৬৫৬ সিপাহি	০৯-১০-৭৭	২৮-১০-৭৭
১১৩।	৭৭০৪/এ	আবুল হাশেম	৬৩৮২৫৫৫ Hav/SMS	০৯-১০-৭৭	২৮-১০-৭৭
১১৪।	৭৭২৬এ	সাহাদৎ হোসেন	৬২৮৪৬৯১ সিগন্যাল	১৫-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭
১১৫।	৭৭২৭/এ	সিরাজুল হক	৬২৭৪২৪৯ হাবিলদার	০৯-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭
১১৬।	৭৭২৮/এ	ফকর উদ্দিন চৌধুরী	৯৭৮০ বিজেও	১০-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭
১১৭।	৭৭২৯/এ	হাফিজ আহম্মেদ ভুইয়া	৬২৮১৮৯৪ হাবিঃ ক্লার্ক	১০-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭
১১৮।	৭৭৩০/এ	কে এম জালাল হক	৬২৭৩৫০৬ হাবিলদার	১০-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭
১১৯।	৭৭৩১/এ	ফাহিম উদ্দিন	৬২৮৬২২৮ U/L.N.K	০৯-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭
১২০।	৭৭৩২/এ	আবুল কাশেম	৬২৮০৩৮০ সিগন্যাল	০৯-১০-৭৭	৩০-১০-৭৭

একজনের নাম ও পদবি অস্পষ্ট থাকায় ছাপানো সম্ভব হলো না।

কুমিল্লায় যে ৭২ জনের ফাঁসি হয়

ক্রমিক	নাম	ব্যাজ নং ও পদবি	ফাঁসির তারিখ
১.	হারুন অর রশিদ	সার্জেন্ট ৭৭৩৬২	৩০-১০-৭৭
২.	এস এম নাসির	সার্জেন্ট৭৬৪৯১	৩০-১০-৭৭
৩.	মোতাহার হোসেন	সিপাহি ৫০০২৭৮	৩০-১০-৭৭
৪.	মোসলেম উদ্দিন	সিপাহি ৫০০২৯১	৩০-১০-৭৭
৫.	তোফাজ্জল হোসেন	কর্পোরাল ৪৪০৩৮২	৩০-১০-৭৭
৬.	শামসুল আলম	সিপাহি ৫০০১৯৭	৩০-১০-৭৭
৭.	লোকমান হোসেন	সিপাহি ৫০০২০৬	৩০-১০-৭৭
৮.	বশির আহমেদ	সিপাহি ৫০০২১৮	৩০-১০-৭৭
৯.	দেলোয়ার হোসেন	কর্পোরাল ৮৪৪৯৩	৩০-১০-৭৭
১০.	আশরাফ হোসেন	কর্পোরাল ৮৪৪৬১	৩০-১০-৭৭
১১	সিদ্দিকী	সার্জেন্ট ৭৬৪৯৯	২৯-১০-৭৭
১২	ইব্রাহিম খান	সিপাহি ৬৫৮৭২১২	২৯-১০-৭৭
১৩.	মকবুল হোসেন খান	সার্জেন্ট ৭৬৯৫১	২৯-১০-৭৭
১৪.	আনিসুর রহমান	ওয়ারেন্ট অফিসার৭২১৭২	২৯-১০-৭৭
১৫.	শাহজাহান আলী	কর্পোরাল ৮২৫৬৩	২৯-১০-৭৭
১৬.	আবদুল লতিফ	কর্পোরাল ৭৬৪৮০	২৯-১০-৭৭
১৭.	এ কে এম জব্বার	কর্পোরাল ৪৪০৪২০	২২-১০-৭৭
১৮.	নূরুল হক	সিপাহি ৫০০২২১	২২-১১-৭৭
১৯.	আজিজুল হক	কর্পোরাল ৮৩২১১	২২-১১-৭৭
২০.	শেখ লুৎফর রহমান	সার্জেন্ট ৭৭৪২৬	২২-১১-৭৭
২১.	শফিকুর রহমান	এলএসি ৮৪৫৯৭	২২-১১-৭৭
২২.	গোলাম রহমান	ওয়ারেন্ট অফিসার ৭০৭৭৭	২২-১১-৭৭
২৩.	আজিজুর রহমান	সার্জেন্ট ৭৭৩৪৩	২২-১১-৭৭

২৪.	মহিউর রহমান	কর্পোরাল ৪৪০১৪৪	২২-১১-৭৭
২৫.	আবদুর রব	ল্যান্স নায়েক ৫০০১৮৭	২২-১১-৭৭
২৬.	শামসুল হক	এলএসি ৮৪৩১০	২২-১১-৭৭
২৭.	ইমন আলী	ল্যান্স নায়েক ৫০০০৭০	২২-১১-৭৭
২৮.	এ কে এম সাইফুল আমিন	কর্পোরাল ৮৪৬৩৪	২২-১১-৭৭
২৯.	মোফাজ্জল হক	কর্পোরাল ৮৪৬৭৯	২২-১১-৭৭
৩০.	শামসুল হুদা	ল্যান্স নায়েক ৫০০০৮০	২২-১১-৭৭
৩১.	কবির আহমেদ	৭৩৩০১	২১-১১-৭৭
৩২.	আফতাব উদ্দিন আহমেদ	কর্পোরাল ৮৩২৮২	২১-১১-৭৭
৩৩.	এ বি সিদ্দিকী	সার্জেন্ট ৭৬৯২২	২১-১১-৭৭
৩৪.	আসাদুজ্জামান	এলসি ৪৪০১৯৩	২২-১১-৭৭
৩৫.	মনোয়ার উদ্দিন	সার্জেন্ট ৭৫৯০৩	২২-১১-৭৭
৩৬.	খিরাজুল হক মল্লিক	কর্পোরাল ৪৪০৪৮৩	২২-১১-৭৭
৩৭.	রফিকুল ইসলাম	কর্পোরাল ৮৪৮৫১	২২-১১-৭৭
৩৮.	মাহবুবুর রহমান	কর্পোরাল ৮৩৯৪৫	২২-১১-৭৭
৩৯.	জহুরুল হক	কর্পোরাল ৮৪৬০৭	২১-১১-৭৭
৪০.	শফিকুল ইসলাম	নায়েক ৬৮০৩৮৮১	২৫-১১-৭৭
৪১.	তোফাজ্জল হোসেন	নায়েক ৭৭৫৯৩৬৬	২৫-১১-৭৭
৪২.	আজমল হোসেন	নায়েক ৭৭৫৯৩৭	২৫-১১-৭৭
৪৩.	জহিরুল হক	নায়েক ৭৭৫৯৩৬৭	২৫-১১-৭৭
৪৪.	মজিবুর রহমান	নায়েক ৬২৭৮৮৫৫	২৫-১১-৭৭
৪৫.	মিল্লাত হোসেন	হাবিলদার ৬২৭৩৫১১	২৫-১১-৭৭
৪৬.	তাজুল ইসলাম	নায়েক/এসটি ৬৫৭৭০০৬	২৫-১১-৭৭
৪৭.	মনির উদ্দিন নায়েক	সুবেদার বিজেও ৮০৭০৩	২৫-১১-৭৭
৪৮.	গিয়াস উদ্দিন	সিগন্যালম্যান ৬২৮৫০৪৯	২৫-১১-৭৭
৪৯.	আব্দুল আজিজ	সিগন্যালম্যান ৬২৮৫৪৭৫	২৫-১১-৭৭
৫০.	নূরুজ্জামান	৭০৫২২৬৮	২৫-১১-৭৭
৫১.	আবদুর রহিম	ল্যান্স নায়েক ৫০০০৭১	২৫-১১-৭৭
৫২.	ইউসুফ আলী	সিপাহি ৫০০৬৬৭	২৫-১১-৭৭
৫৩.	মকবুল হোসেন	হাবিলদার ৬২৭৮১৭৮	২৫-১১-৭৭
৫৪.	আবুল হেসেন	সার্জেন্ট ৭৫২৬৫	২৫-১১-৭৭
৫৫.	তাজুল ইসলাম	সার্জেন্ট ৭৮০৪২	২৫-১১-৭৭
৫৬.	এম লিয়াকত উল্লাহ	সার্জেন্ট ৮৩৬৮০	২৮-১২-৭৭
৫৭.	জালাল উদ্দিন	নায়েক ৬২৮৫৬১৮	২৮-১২-৭৭
৫৮.	এ কে এম সোলায়মান	৭২৯৮৫	২৮-১২-৭৭
৫৯.	মুকতার উদ্দিন	ল্যান্স নায়েক ৬২৮২২১০	২৮-১২-৭৭
৬০.	বজলুর রহমান	সিগন্যাল ৬২৮৪৪৬৩	২৮-১২-৭৭
৬১.	নূরুল ইসলাম	কর্পোরাল ৪৪০১৮৩	২৮-১২-৭৭
৬২.	মোশারফ হোসেন	কর্পোরাল ৪৪০৬৫১	২৮-১২-৭৭
৬৩.	আবদুল জলিল	সার্জেন্ট ৭৪৭৩১	২৮-১২-৭৭
৬৪.	সাইদুল ইসলাম	কর্পোরাল ৮৪৯৬৪	২৮-১২-৭৭
৬৫.	শামসুল আলম	সার্জেন্ট ৮০৪৯০	২৮-১২-৭৭
৬৬.	আবুল হোসেন মজুমদার	সার্জেন্ট ৭৫৩১৮	২৮-১২-৭৭

৬৭.	আয়ুব আলী	সার্জেন্ট ৭৫৩১৮	২৮-১২-৭৭
৬৮.	এম এ বাশার	কর্পোরাল ৪৪০০৫৫৮	১২-১-৭৮
৬৯.	এ বি সিদ্দিকী	কর্পোরাল ৮১৭৭৪	১২-১-৭৮
৭০.	আফসার আলী খান	সার্জেন্ট ৭৯১১৩	১২-১-৭৮
৭১.	আবদুর জব্বার	ল্যান্স নায়েক ৩৯৪৯২৮৬	২৭-১-৭৮
৭২.	রুহুল আমিন	সার্জেন্ট ৭৪৮১২	২১-১১-৭৭

বগুড়া কারাগারে যে ১৬ জনের ফাঁসি হয়

ক্রমিক	কয়েদি নং	নাম ও পিতার নাম	ব্যাজ নং ও পদবি	ফাঁসির তারিখ
১.	৪১৬২/এ	মোঃ মকবুল হোসেন পিতা : আশরাফ আলী মণ্ডল	সিপাহি নং-৩৯৫৬৬৪৫৬	২১-১০-৭৭
২.	৪১৬৩/এ	মোঃ ওমেদ আলী পিতা : রমজান আলী	সিপাহি নং-৩৯৫৬৪৩৬	২১-১০-৭৭
৩.	৪১৬৪/এ	মোঃ শামসুল আলম পিতা : ইয়াকিন আলী সমদ্দার	সিপাহি নং-৩৯৫৩০৮৭	২১-১০-৭৭
৪.	৪১৬৫/এ	মোঃ আব্দুর রশিদ পিতা : বদরুদজ্জা	সিপাহি নং-৩৯৬৪১৭৫	২১-১০-৭৭
৫.	৪১৬৬/এ	আব্দুল জলিল শেখ পিতা : অহেদ আলী শেখ	ল্যান্স নায়েক নং ৩৯৪৯০৪৮	২১-১০-৭৭
৬.	৪১৬৭/এ	কেরামত আলী পিতা : মৃত মোহাম্মদ আলী	নায়েক নং ৩৯৩৬৯১৫	২২-১০-৭৭
৭.	৪১৬৮/এ	সুকুমার চন্দ্র দাস পিতা : সতীশ চন্দ্র দাস	এনসিএসই নং ৩৯৫৬৬২	২২-১০-৭৭
৮.	৪১৬৯/এ	আফাজ উদ্দিন পিতা : ছমির উদ্দিন	হাবিলদার নং ৩৯৩৬৯৪০	২১-১০-৭৭
৯.	৪১৭১/এ	মোঃ মুসলেম উদ্দিন হাওলাদার পিতা : মো অকেন আলী মণ্ডল	সিপাহি নং কুক ৬৮০৯৬৮৫	২১-১০-৭৭
১০.	৪১৭২/এ	আবদুল জব্বার পিতা : মহিরুদ্দিন	ল্যান্স নায়েক নং-৩৯৪৯২৮৬	২১-১০-৭৭
১১.	৪১৭৩/এ	আনছার আলী মোল্লা পিতা : হাতেম আলী মোল্লা	সিপাহি নং- ৩৯৫০৪০৭	২১-১০-৭৭
১২.	৪১৭৪/এ	মোঃ ইউনুছ আলী পিতা : শেখ আলতাফ হোসেন	নায়েক নং ৩৯৫৬২৪৯	২২-১০-৭৭
১৩.	৪১৭৫/এ	মোঃ আবদুল বারেক মিয়া পিতা : শামসুল হক মিয়া	সিপাহি নং ২৯৫৬৫০৫	২২-১০-৭৭
১৪.	৪১৭৬/এ	দবির আলী ভুইয়া পিতা : আলেক ভুইয়া	সিপাহি নং ৩৯৫৬৫২৩	২১-১০-৭৭
১৫.	৪১৭৭/এ	মোঃ আবদুল বারেক ওরফে আবদুল বারী পিতা : সাইদ আলী মোল্লা	সিপাহি/জিডিএ নং ৬৮০৬১৯১	২২-১০-৭৭
১৬.	৪১৭৮/এ	আব্দুল জব্বার হাওলাদার পিতা : আদম আলী হাওলাদার	সিপাহি নং ৩৯৫৬৫১৮	২১-১০-৭৭

এই ১৬ জনের ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয় '৭৭ সালের ১৮ অক্টোবর।

প্রহসনের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত সামরিক ট্রাইব্যুনালের গেজেট

THE MARTIAL LAW TRIBUNAL REGULATION, 1977.

MARTIAL LAW REGULATION NO.V OF 1977.

[14th October, 1977]

WHEREAS it is expedient to make a Martial Law Regulation for the purpose hereinafter appearing.

Now, THEREFORE, in pursuance of the Third Proclamation of the 29th November, 1976, read with Proclamations of the 20th August, 1975, and the 8th November, 1975, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the chief Martial Law Administrator is pleased to make the following Martial Law Regulation, namely:-

1. Short title.- This Regulations may be called the Martial Law Tribunal Regulation, 1977.
2. Definitions. In this Regulation, unless there is anything repugnant in the subject or context.-
   (a) 'Chairman' means the Chairman of a Tribunal.
   (b) 'Defence Service Law' means the Army Act. 1952 (XXXIX of 1952), the air Force Act. 1953 (VI of 1953). and the Navy Ordinance, 1961 (XXXV of 1961);
   (c) 'member' means a member of a Tribunal:
   (d) 'officer of the Defence Service' means an officer within the meaning of any of the Defence Service Law; and
   (e) 'Tribunal' means a Martial Law Tribunal constituted under paragraph 4.
3. Overriding effect of this regulation.- This Regulation shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Martial Law Regulation or in any other law for the time being in force.
4. Constitution of Martial Law Tribunal.
   (I) The Governing may by notification in the official Gazette. Constitute such number of Martial Law Tribunals as it may deem fit and each such Tribunal may be for such area or areas or for trial of such cases or classes of cases as may be specified in the notification or as the Government may direct.
   (2) A Tribunal constituted under subparagraph (I) shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the Government.
   (3) The Chairman shall be appointed from amongst the officers of the Defence Services and the four other members shall be appointed from amongst the junior commissioned officers and non-commissioned officers of the

Bangladesh Army or their equivalent in the other Defence Services and other persons enrolled under the Defence Service Laws.

(4) A Tribunal may try any offence, whether committed before or after the commencement of the Regulation, punishable-

(a) Under Chapter VI or VII of the Penal Code (Act XLV of 1860);

(b) under the Army Act. 1952 (XXXIX of 1952), the Air Force Act 1953 (VI of 1953), the Navy Ordinance, 1961 (XXXV of 1961), or any rules or regulations made thereunder;

(c) under Regulation 13 or 17 of the Martial Law Regulations, 1975 (Martial Law Regulations No. 1 of 1975): or

(d) as attempt or conspiracies to commit or abetments of, or preparations for commission of any of the offences mentioned in clauses (a), (b) and (c).

5. Offences to be cognizable etc.-

(1) All offences punishable under this Regulation shall be cognizable.

(2) No person accused or convicted of an offence punishable under this Regulation shall, if in custody, be released on bail by any Court or Tribunal without the consent of the prosecution.

6. Power and Procedure on Tribunal.-

(1) A Tribunal shall take cognizance of an offence on a report in writing made by any officer of any of the Defence Services, or by any junior commissioned officer of the Bangladesh Army or equivalent in the other Defence Services.

(2) A Tribunal may sit at such times and places as it may deem fit; and if the chairman so decides the Tribunal shall sit in camera.

(3) If, in the course of a trail, not more than two members, other than the Chairman are for any reason, unable to attend any sitting thereof, the trail may continue before the other three members, including the Chairman.

(4) A Tribunal shall not, merely by reason of a change in its membership or the absence of any one or two members thereof from any sitting, be bound to recall or rehear any witness whose evidence has already been recorded, or to reopen any proceedings already held, any may act on the evidence already given or produced before it.

(5) The memorandum of the substance of the evidence of each witness shall be taken down by the Chairman, or by such other member as the Chairman may direct, and Shall be signed by him or such other member, and shall form part of the record.

(6) A Tribunal trying an offence under this Regulation shall try the offence summarily, in so far as it may be, in accordance with the procedure laid 130 down in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), for summary trail of summons cases.

(7) Decision to the Tribunal shall be given accordance with the decision of the majority.

(8) In respect of matters not provided for in this Regulation, a tribunal may follow such procedure as it may deem fit for trail of a case.

(9) A Tribunal may pass any sentence authorized by the Martial Law Regulations or laws for the punishment of the offence tried by it.

(10) All sentence of death or transportation for life shall have to be confirmed by the Chief Martial Law Administrator.

[1][(10a)When a sentence of death or transportation for life is submitted to the Chief Martial Law Administrator for confirmation, he may either confirm the sentence or reduce it or set it aside or vary or modify it and may also. while confirming a sentence of death, alter the mode of execution of the sentence.]

(11) Where a person is sentenced to death, the sentence shall be executed by shooting him by a firing squad till he is dead or hanging him by neck till he is dead as the Tribunal may direct.

Explanation.- For the purpose of this paragraph, a firing squad shall consist of five members of any of the Defence Services of Bangladesh as the 'Tribunal' may direct.

(12) No appeal shall lie to any authority whatever from any decision or judgement of a Tribunal.

(13) Any person authorized by the Chief Martial Law Administrator or by a person empowered by him in this behalf may conduct the prosecution before a Tribunal and the person so authorized shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(14) No lawyer shall appear or plead before a Tribunal on behalf of the accused but the accused my be assisted and advised by any person he choose who shall be called the friend of the accused.

7. Where a Tribunal sits in camera, the Chairman may require any person attending or otherwise participating in the conduct of the trail to make an oath of secrecy that he shall not disclose anything that has come to his knowledge in, or in connection with, such trail; and disclosure of any information in contravention of the oath shall be punishable with imprisonment for a team which may extend to three years and with fine.

[1] *[Sub-paragraph (10a) was inserted by M.L.R. No. VI of 1977.*

বিচার বিভাগীয় কমিশনে
মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীর জবানবন্দি

Deposition of witness No.3

Major General Mir Shawkat Ali, General Officer Commanding of No. 9 Infantry Division.

My name is Major General Mir Shawkat Ali, General Officer Commanding of No. 9 Infantry Division.

Qn. How many divisions are there?

Ans. There are five divisions in Bangladesh. 9 Division and 11 Division are Infantry Divisions and other Divisions are light Divisions. Bogra cantonment is under 11 Division. The Dacca Cantonment is under station head Quarters, Dacca.

Qn. Who is in-charge of that station Head Quarters?

Ans. Colonel Mahmud is the Station Commander.

He comes under the log Area Commander whose name is Brigadier Bari. For operation purpose it is under Divisional Commander.

Qn. Will you please tell us in brief what you know about the occurrence at Dacca?

Ans. I reside within Dacca Cantonment but I hold my office in Sher-e-Bangla Nagar. The honourable President rang me up at about 1-20 am on 2.10.77 asking me if I heard any firing. I said I was in an Air-conditioned room and was sleeping and I would him know after check up. I checked up from my guard who informed me that some firing was going on. The president then asked me to rush to my office. Accordingly, I went to my office at Sher-e- Bangla Nagar. Thereafter I contacted my Commanders at different places and ensured that everybody was alert and was taking necessary precaution. However. I could not contact 46 Brigade commanders, Col. Aminul Haque, whom I had previously directed on telephone from my house to go to his office immediately. Then I asked my G.S.O . I and A.D.C to locate Col Aminul Huq. After half and hour or so I was put through by my A.D.C to him in 8 E Bangal C.O's office which is not his office. I asked Col. Aminul Huq why he was not in his office inspite of my direction. He said that his office was in a very insecure place, that why he came to E Bangl C.O's office. However, I gave him quick orders which i had already given to his C.O. directly because of his absence. The orders were 'do not get panicky, make perimeter Defence, that is, establish a perimeter Defence and ensure that none of the unit personnel resort to any act of ill discipline.' I remind him of the pride of being a soldier at this critical juncture. Then I told him 'in case any body approaches from other unites capture them and in case they attack or try to subvert own troops shoot to kill them.'

Then I was having telephone talks with Deputy Chief of Army Staff. I was keeping contact with the Chief, Deputy Chief and C.G.S. as Crisis developed at Banani Gate where 8E Bengal Regiment came under attack by the mutineers. However. They

were alert and repulsed the attack causing casualties to the mutineers. When C.G.S rang up me and asked if I could send some troops to guard C.O.D. I said I was arranging. I rang up 46 Brigade commander again asked him to dispatch a coy of troops to C.O.D. to which he said that he was not in a position to dispatch any troops. I conveyed the same things to the C.G.S. and also remind C.G.S. that the light Ack Ack Brigade and Engineer Brigade were very close to C.O.D. and asked how about sending them. Later I ordered 46 Brigade Commander to establish a road block at banani Gate on the main road with a view to capturing the mutineers on their way back from C.O.D. then I also told him to establish a similar road block with 19 E Bengali troops on the main road near M.P. third Gate. 46 Brigade Commander said that he would try to do that. At the same time I ordered the 2nd Field Regiment C.O. Maj (now Lt. Col) Mahiuddin to establish similar road block in front of pathological Laboratories on the cross road. This I did with a view to apprehending the mutineers should they come on that road. At the same time I instructed 8 I brigade to establish a block at Joydebpur chowrasta. Mirpur troops were told to put speed boats in the water with a view to apprehend mutineers crossing from new Airport side via water route.

I directed my G.S.O.I to inform the duty officer at Radio Station that nobody should be allowed to enter the Dacca radio Station and I ordered to shoot to kill anyone entering the radio Station.

I got call from D.G.F.I to send troops to Airport area informing me that a lot of mutineers and gathered there. Again I asked 46 Brigade Commander to dispatch a company to Airport to which his answers were again negative. The troops who had gone to the radio station were coming back to DIV Headquarters after recapturing the Radio Station. The moment they reached the Div Headquarters, I ordered them to cross over the Airport boundary wall and the task given to them was to capture Airport Terminal building with a view to rescuing Air Chief. These troops moved very fast and captured the Airport within half an hour. The Air Chief was rescued along with the honourable Vice-President and the Foreign Secretary by Captain Sadik's platoon. About 50 mutineers were captured at the Airport. After this situation was fairly stabilized and various position and blocks were established all along and by 0500 hours the whole situation was under control.

Qn. Can you tell us why the Jawans rose in arms causing a Mutiny?

Ans. I Cannot tell the exact cause of this particular mutiny but I may throw some light with my experience in the Army which contributes a lot towards, the occurrence of such an incident:-

1) After liberation a lot of people were taken in the Army without character verification and later on it has been found that even dacoits or people with case still hanging against them in the court somehow managed to enter in the Army. Even though some verifications were made yet we find that the police did not do it properly.
2) We have expanded a lot and too fast so the rank structure in the Army and the command structure in the Army falls short of adequate experience and training.
3) Possible unscrupulous means were adopted by politicians for their own interest

in the way of subverting certain personnels to fall prey to tangible motivation and bonafides.

4) Army's involvement in Martial Law and internal security duties for a long period thus reducing the training time which actually disciplines the troops.
5) High expectations due to motivation by wrong quarters such as one Air Force Sergent who is a BALLB thinks that his officers are Matriculate or Intermediate in Science or graduates then why he should not get the status the officers are getting.
6) Activates of Anti-State political parties and interested foreign countries.
7) Continued presence of politically motivated persons in service who had not be methodically identified and removed since last two Years.

Qn. Have you found ill treatment of the Jawans by the officers?

Ans. There is no ill treatment of jawans by officer. All punishments in Army are corrective in nature and not punitive.

Qn. Do you think that the pattern of Bogra and Dacca incidents are similar and the organizers are the same?

Ans. I can not fully comment on that but these might be isolated or combined.

Qn. When you speak of interested foreign countries can you name any?

Ans. It could be any country.

Qn. Do you think the hijacked plane over which not much has been done has any connection or relevancy with the recent incident:-

Ans. Sir, again it is a conjecture. It could have or it could not have. However, certain points are worth examining:-

a) hijacked embarked at Bombay with their explosives and parafernilias.
b) They were not allowed to land At Calcutta and the hijackers listened to it. Indian Air Force Trainer plane escorted the hijacked plane up to the border of Bangladesh.
c) Thought it accepted the refusal in landing at Calcutta. yet it forcibly landed in Bangladesh inspite of refusal from Dacca.
d) When Recee and Support battalion captured the Terminal Building from my Division Headquarters side. It was found that the hijacked plane was between the attacking force and the Terminal Building. I have a question; what or who guaranteed the hijackers that this particular attack was not for them? Why the hijackers did not react throughout the entire incident?

Qn. Did this hijack incident help the mutineers?

Ans. Definitely the hijack incident gave advantage to the mutineers in their operation.

Read over and explained to the witness who admitted it to be correctly recorded.

President
Commission of Enquiry

জেনারেল এরশাদের চিঠি

[illegible]

Dear Presidium Members,

Nothing to worry, they cannot frame me. Emdad was forced but did not mention my name. He said about Aziz and Latif. Aziz is dead & Latif has not said anything. He cannot, because I had no communication with him in those days. This case is going to be 'Agartala' of BNP.

Please stay together and organise the Party for Election. We don't want to be deciding factor in the next election. We want to win and form the Govt. After this futile & dangerous episode it will be easy for us to win. Please pass it on to all party members. Our slogan will be:-

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

-৪-

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Allah is great. HE has given us an golden opportunity. Dont miss it.

Tell all workers we want to go to power by the grace of Allah. Nobody wants to vote for 3rd party. Iron out your differences, be together, and avail this God given opportunity. Save my life and also save yours.

yours - [illegible]

P.S: Please maintain complete secrecy about this, I dont want to see this printed in News-paper, It will be dangerous for me.

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্ম

ডিমাপুরের সেই ইতিহাস

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশের বিমানবাহিনী। '৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ভারতীয় রাজ্য নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে ক্ষুদ্র আকারে জন্ম নিয়েছিল এ বাহিনী। একটা অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার, একটি ডিসি-৩ ও একটি অটার বিমান এবং মাত্র নয়জন অফিসার ও ৪৭ জন বিমানসেনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আজকের গৌরবময় বিমানবাহিনী। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজয়ের পর আত্মসমর্পণের আগ মুহূর্তে পাকিস্তানিরা সব যন্ত্রপাতি ও উড়োজাহাজ অকেজো করে দিয়েছিল। ফলে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী শুরু করেছিল একেবারে শূন্য থেকে।

কর্নেল ওসমানী ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার (যথাক্রমে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও পরে জেনারেল এবং মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান ও পরে এয়ার ভাইস মার্শাল) ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিমানবাহিনী গঠন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং ১৯৭১-এর ১৪ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক সে আলোচনা সমাপ্ত হয়। প্রস্তাবিত সশস্ত্র বিমানবাহিনী গঠনে ভারত তিনটি কমব্যাট বিমান জোগাতে রাজি হলো। এ বিমানগুলো ছিল : একটি ডিসি-৩, একটি অটার এবং একটি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার। এ ধরনের বিমান নির্বাচনের পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল যে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশে অনুরূপ বা একই ধরনের বিমান ব্যবহার করছিল। ফলে এ ধরনের কোনো বিমানকে পাকিস্তানিরা গুলি করে ভূপাতিত করলেও তার মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন জাগতো।

শুরুটা ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে গভীর জঙ্গলে পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত একটি পরিত্যক্ত বিমান উড্ডয়ন ক্ষেত্র বিমানবাহিনী গড়ার জন্মভূমি নির্বাচিত হলো। কারণ এই ডিমাপুরে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট লম্বা রানওয়ে ও একটি ছোট কাঠের তৈরি এটিসি ভবন ছিল। বিমান ঘাঁটি থেকে বেশ কিছু দূরে ছিল ডিমাপুর শহর। কিছু পাহাড়ি আদিবাসী ছাড়া পরিত্যক্ত বিমান ঘাঁটির ধারেকাছে তেমন কেউ বাস করতো না। তাই স্বাধীনতা যোদ্ধাদের জন্য গোপনীয় সশস্ত্র বিমান কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ স্থানটি ছিল সবদিক থেকে উত্তম।

সশস্ত্র বিমানবাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে গুপ্ত নাম ব্যবহৃত হলো ' কিলো ফ্লাইট'। 'কিলো ফ্লাইট' অতি গোপনীয় পরিচালনা হিসেবে পরিগণিত হলো এবং এর অস্তিত্ব বিডিএফ (বাংলাদেশ ফোর্সেস) ও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কেউ জানতেন না।

কিলো ফ্লাইটের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বিমানসেনা সংগ্রহের লক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ বিডিএফ সদর দপ্তর থেকে কিছু প্রতিনিধি বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হয়। তারা যশোর ও আগরতলার কাছের সেক্টরসমূহ থেকে যতদূর সম্ভব বিমানসেনা সংগ্রহ করতেন। চূড়ান্তভাবে ৫৮ জন বিমানসেনাকে ডিমাপুরে নেওয়া হয়। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ চট্টগ্রামে মদুনাঘাট বিদ্যুৎ সাব স্টেশন আক্রমণের সময় তখন বুলেটে আহত অবস্থায় ১ নং সেক্টরে ছিলেন। তিনিই 'কিলো ফ্লাইট'-এর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচিত হন এবং সে অনুযায়ী নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তিনি ডিমাপুরে যান।

মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অটার বিমান

সুলতান মাহমুদ দায়িত্ব নেওয়ার পর ডিমাপুরে ছোট বিমানবন্দরের এটিসি কুঁড়েটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। উৎসাহী বিমানসেনারা ভবনের নিচতলায় ও কাছাকাছি খাটানো তাঁবুতে অস্থায়ী ছাউনি নির্মাণ করেন। পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম পাঁচজন বেসামরিক পাইলট নিয়ে এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ যোগ দেন।

উৎসাহী সদস্যরা মাত্র তিনটি বিমানের (একটি ডিসি-৩, একটা অটার ও একটা অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার) সমন্বয়ে গঠিত তাদের স্বপ্নের বিমানবাহিনীর যাত্রা শুরুর দিন ধার্য করলেন ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। বিমানগুলোকে বিমানবাহিনীর প্রতীক ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সজ্জিত করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার, ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল পিসি লাল ডিমাপুরে উপস্থিত হন। অনাড়ম্বর একটা গার্ড অব অনারের আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত অতিথিদের সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় বাংলাদেশ বিমানবাহিনী।

ইতিমধ্যে ফ্লাইট টেস্টের সময় দেখা গেলো যে বোমা নিক্ষেপ করে সরে আসার সময় ডিসি-৩-এর নিঃসৃত আগুন শত্রুদের টার্গেট হিসেবে সুষ্ঠুভাবে প্রস্ফুটিত করবে। তাই ঐ জাহাজটি কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তবে পরবর্তী সময়ে বিমানটি বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অধিনায়কদের বহন করার জন্য ব্যবহৃত হতো। অটার এবং অ্যালুয়েট নৈশ চলাচল ও টার্গেট অনুশীলন চালিয়ে যেতে থাকলো।

পাইলটদের প্রশিক্ষণ শুরু হয় '৭১-এর অক্টোবর থেকে। তিনটি প্রাপ্ত বিমানে যথাযথ অপারেশন প্রশিক্ষণের জন্য পাইলটদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম এবং ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারে, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন সরফুদ্দিন ও ক্যাপ্টেন আকরাম অটার বিমানে এবং ক্যাপ্টেন খালেক, মুকিত ও সাত্তার ডিসি-৩ বিমানে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তিনটি বিমানকেই পরিবর্তন করে জঙ্গি বোমারু হিসেবে রূপায়ণ করা হয়। ডিসি-৩ বিমানের লেজের অংশটি তিনটি বম্ব র‍্যাকের স্থান সংকুলানার্থে কেটে বাদ দেওয়া হয়। অটার-এ প্রতিটিতে সাতখানা রকেটের সংকুলান সম্ভব, এমন দুটি রকেট পড, কার্গোদ্বারের কাছে ঘূর্ণায়মান হাতলসহ একটি ৩০৩ ব্রাউনি মেশিনগান এবং লেজের অংশে তিনটি বম্বর‍্যাক স্থাপন করা হয়। অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারে প্রতিটিতে সাতখানা রকেটের সংকুলান সম্ভব এমন দুটি রকেট পড, একটি ঘূর্ণায়মান ৩০৩ ব্রাউনি মেশিনগান স্থাপন করা হয় ও ২৫ পাউন্ডের বোমা হাত দিয়ে ছোড়ার জন্য ভেতরে রাখার র‍্যাক বানানো হয়। কোনো জাহাজেরই ক্যামেরা বা সাইট ছিল না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাইলটের সামনের আয়নায় একটা রেডক্রস আঁকা হলো এবং তাই দিয়ে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারিত হতো।

প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, রাতের অন্ধকারে গাছের উচ্চতায় ফ্লাইং করে তেলের ডিপোগুলোর ওপর আক্রমণ করা হবে। এ জন্য প্রয়োজন ছিল উচ্চমানের ফ্লাইং ও ফায়ারিং প্রশিক্ষণ। রাতের ঘন অন্ধকারে বিভিন্ন অজানা ধরনের টার্গেটকে অনুমান করে, বিভিন্ন পথ দিয়ে টার্গেট এলাকায় পৌঁছানো ও (যদি ভাগ্যবান হয়) মাত্র দুটি আক্রমণ করার পর দ্রুত প্রস্থান।

এরপর প্রশিক্ষণ শুরু হলো তেলের ডিপোকে সিমুলেট করার। গাছের ওপর (হাইট) দিয়ে ফ্লাইং করা এবং ১২০ থেকে ১৫০ মাইল দূর থেকে নেভিগেশন করে রাতের বেলা (অজানা ছিল কোথায় পাওয়ার লাইন বা টাওয়ার), শত্রু বুঝে ওঠার আগেই সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ করা
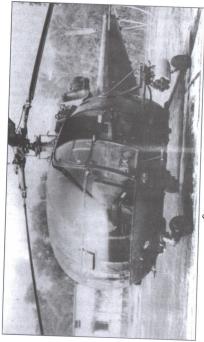
মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার

এবং ধীরে চলা জাহাজ নিয়ে শত্রুর বিমানবিধ্বংসী কামান ও মেশিনগান ফায়ারিং এড়িয়ে চলা।

টার্গেট হিসেবে ঘন জঙ্গল কেটে টিলার মাথায় সাদা একটি প্যারাসুট বিছানো হয়েছিল। শুরুতে ২৫ মাইল দূরে অরণ্যের মাঝে ছোট্ট টিলায় প্যারাসুট খুঁজে পাওয়াটাই ছিল দুরূহ। আর হালকা হাওয়াতেই হেলিকপ্টার আর অটারটি যেন নেচে উঠতো। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান যেন সার্কাস ট্রেনারের মতো সারা দিনরাত লেগে থাকতেন। সারা রাত ফ্লাইংয়ের পর ফজরের নামাজ পড়েই আবার শুরু হতো ভোরের শরীরচর্চা। তারপর রানওয়ের এক মাথা থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিন মাইল দৌড়। একই এক্সারসাইজে যোগ দিতেন স্বয়ং কন্টিনজেন্ট অধিনায়ক– যদিও যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন তিনি ('কিলো ফ্লাইট'-এ একটা লাঠিতে ভর করে চলতেন)।

প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর দেওয়া হয় গাছের শীর্ষ বরাবর নৈশ অপারেশনের ওপর। সাধারণত ফ্লাইং শুরু হতো রাত ১২টার পর। তাই রাতে ডিমাপুরে পাহাড়গুলো রকেট ও বন্দুকের গোলায় প্রতিধ্বনিত হতো। টার্গেট নিরীক্ষার মাঝে প্রমাণিত হলো, ডিসি-৩ বিমানের আক্রমণে গোপনীয়তা ও আকস্মিকতা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সেটাকে কলকাতায় পরিবহনের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

পাকিস্তান বাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্রথমে দিন ঠিক হয়েছিল নভেম্বর মাসে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ডিমাপুর থেকে কৈলা শহর পর্যন্ত যাওয়ার পর অজানা কারণে তাদের ফেরত যেতে হয় আবার ডিমাপুর। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী যখন কলকাতায় ঘোষণা করলেন, ভারতের ওপর পাকিস্তানিদের আক্রমণের জবাব দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তখন আবার ২৯ নভেম্বর কৈলা শহর এয়ারফিল্ডে যেতে হয়।

একাত্তরের যুদ্ধ এবং বিমানবাহিনীর প্রাথমিক দিনগুলো

১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর বা বিমানবাহিনীর পাইলটরা যখন বাংলাদেশে অবস্থানরত শত্রুদের অবস্থানসমূহে আঘাতের জন্য ভারতীয় বিমান ঘাঁটি ত্যাগ করে, তখন সবাই এই অভিযানের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করলেন। অ্যালুয়েটের জন্য প্রথম টার্গেট নির্ধারিত হলো নারায়ণগঞ্জের কাছে গোদনাইল জ্বালানি সংরক্ষণাগার আর অটারের জন্য চিটাগাং বন্দরের কাছে তেল ডিপো। সীমান্তের কাছে আসার জন্য ২৯ নভেম্বর ১৯৭১-এ পাইলট ক্রুসহ দল দুটি তাদের বিমান নিয়ে ডিমাপুর ত্যাগ করে কৈলা শহরে অবস্থান নেয়।

৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সশস্ত্র অভিযান শুরু করে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর পরিচালকরা নির্দিষ্ট টার্গেটসমূহের ওপর মধ্যরাতে বিমান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। রাত ৯টায় চট্টগ্রামে তেল ডিপোতে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে 'অটার' কৈলা শহর ত্যাগ করে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম উক্ত বিমানটির ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং সহকারী পাইলট ছিলেন জনাব আকরাম। অভিযানে দুজন এয়ার গানারও অংশ নেন। পথিমধ্যে তেলিয়ামোড়ার ঠিক ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় অটারের সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য মাটিতে একটা সবুজ সংকেত দেখানো হয় একটা কার্টিজ ফুটিয়ে। যথাযথ পথপ্রদর্শনের বন্দোবস্ত না থাকায়, তাদের চলাচলের পথনির্দেশের জন্য আদিম ব্যবস্থারই সাহায্য নিতে হয়েছিল। আকাশে চাঁদ থাকা সত্ত্বেও হালকা মেঘপুঞ্জ ও কুয়াশা ভূপৃষ্ঠকে অস্পষ্ট করে রেখেছিল। সমুদ্র তটরেখা এবং বন্দরের বাইরে নোঙরকৃত জাহাজগুলোর আলো পাইলটদের কাছে আলোক সংকেতরূপে কাজ করছিল। বৈমানিকরা কিছুক্ষণ পরই চাঁদনি আলোয় তেল শোধনাগার দেখতে পারলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই 'অটার' থেকে দুটো রকেট বেরিয়ে তৈলাগারে একটা ছোট্ট আলো জ্বালিয়ে দিলো। অটার-এর ক্যাপ্টেন সেই ছোট্ট আগুন দেখেই তার লক্ষ্য সম্পর্কে পুনর্বার নিশ্চিত হলেন। বৃত্তাকারে ঘুরে তিনি বিপরীত দিক থেকে পুনরায় আরো দুটো রকেট নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তেই আগুন তৈলাধারগুলো গ্রাস করলো। একই সঙ্গে সেই স্থানে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত এন্টি-এয়ার ক্রাফট গানগুলো 'অটার'-এর প্রতি গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। তার পরও 'অটার' দু-দুবার গোটা আকাশ চক্কর দেয় এবং সম্পূর্ণ এলাকা আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস না হওয়া পর্যন্ত আরো রকেট নিক্ষেপ করতে থাকে। উড্ডয়নের সাত ঘণ্টা পরে প্রথম অভিযানের সাফল্য নিয়ে বিজয় উল্লাসে কৈলা শহর বিমানবন্দরে প্রত্যাবর্তন করেন অটার ক্রুরা।

চট্টগ্রামের পথে 'অটার' যখন তেলিয়ামোড়ার আকাশে উড়ছিল, তখন পর্যন্ত 'অ্যালুয়েট' সেখানকার হেলিপ্যাডেই অপেক্ষা করছিল। 'অ্যালুয়েটের' ক্রুরা নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে আঘাত হানার জন্য তাদের মিশন প্ল্যানটা ভালো করে শেষবার মুখস্থ করে নিচ্ছিলেন। চাঁদনি আলো আর ঘন কুয়াশা পরিবেশকে স্বপ্নপুরীতে পরিণত করেছিল। ভাসমান বিস্তৃত জমির ওপরে ভীতিজনক অদ্ভুত সে রাতে আকাশে উড্ডয়ন এক রকম অসম্ভব ছিল, কোনো জটিল এবং বিপজ্জনক অপারেশন পরিচালনা তো দূরের কথা। তবু হেলিকপ্টার ক্রুরা নিজস্ব দেশ ও জমিকে ঠিকই চিনতেন বলেই মিশন সম্পন্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। 'অ্যালুয়েটে' স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ ক্যাপ্টেন এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম সহকারী পাইলট ছিলেন। পথের নিশ্চয়তার জন্য তারা খুব নিচু দিয়েই উড়ে যেতে মনস্থির করলেন। অ্যালুয়েট উড্ডয়ন করেছিল, আগরতলার পূর্বে, মাইল পঁচিশেক দূরে, তেলিয়ামোড়া পাহাড়ি এলাকার একটা টিলার ওপর থেকে।

সেই মধ্যরাতে জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ের চূড়া থেকে ভরা তেল আর এমুনিশন নিয়ে টেক অব করাটাও ছিল অতি বিপজ্জনক। দিন দশেক আগে ভারতীয় বাহিনীর সীমান্তে হামলার ফলে আখউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় পরস্পর মুখোমুখি ছিল মিত্র ও পাকিস্তান বাহিনী। পুরো এলাকায় পাকিস্তানিরা ছিল 'রেড এলার্ট' অবস্থায়। আলো-আঁধারে কুয়াশাময় পাহাড় ছেড়ে সমতল এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় এয়ার গানার সার্জেন্ট শহীদুল্লাহ বীর প্রতীক-এর ভাষায়, প্রিয় বাংলাদেশকে তখন 'স্বপ্নের প্রশান্ত বাংলা' বলে মনে হচ্ছিল। রেললাইন ক্রস করতেই যেন হঠাৎ খই ফোটা শুরু হলো। কোন দিক থেকে ফায়ারিং হচ্ছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। ট্রেসার উড়ছিল চারদিকে। গোপনীয়তা রক্ষার্থে এ মিশন সম্পর্কে নিজ বাহিনীকেও কিছু জানানো নিষেধ ছিল।

সাধারণত শান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি, কো-পাইলট আলম প্রায় চিৎকার করেই বললেন, 'স্যার কোথায় নিয়ে এলেন? আপনি না বলেছিলেন টার্গেটে পৌছানো পর্যন্ত JUST SIT BACK & RELAX, KEEP YOUR EYES OPEN & NAVIGATE.' কিছুই বলার ছিল না, তাই একবার তার দিকে তাকিয়েই স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান আবারও মনোযোগ দিলেন সামনে– তার ছিল শুধু এক দৃষ্টি, এক চিন্তা– টার্গেট। অন্য সব কিছু তার ভাবনা-চিন্তার বাইরে ছিল। কয়েক সেকেন্ড পর জাহাজ ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে আস্তে আস্তে নিচ থেকে ফায়ারিংয়ের আওয়াজ পেছনে পড়ে গেল। নিচে ছিল ঘন কুয়াশা। তাই ফ্লাইং করতে হচ্ছিল সময় আর হেডিংয়ের ওপরে, কিছুটা ইনস্ট্রুমেন্টের ভরসায় আর বাকিটা– যতখানি চোখে দেখা যায়। সময়মতোই তারা ঢাকা-কুমিল্লা মহাসড়কে ইলিয়টগঞ্জের ছোট একটা ডাইভারশন রোডের পাশে যুদ্ধের শুরুতে ভেঙে যাওয়া ব্রিজের ওপর পৌছেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় টার্ন নিয়ে আঁকাবাঁকা সড়ক ধরে

মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানবাহিনীর ডিসি-৩ বিমান

তারা এগোতে লাগলেন নারায়ণগঞ্জের দিকে। সামনে দৃষ্টি ঘন কুয়াশায় আটকে যাচ্ছিল, তাই প্রায় গাছের মাথা ছুঁয়ে উড়ে যেতে হচ্ছিল। মনে মনে সবাই প্রার্থনা করছিলেন যেন, টেলিফোন আর বৈদ্যুতিক খাম্বার সঙ্গে ধাক্কা থেকে বেঁচে যান। শুধু সৃষ্টিকর্তার কৃপায় দাউদকান্দির কাছে মাইক্রোওয়েভ পোল থেকে এবং তারপর দুটো নদী ক্রস করা উঁচু বৈদ্যুতিক খাম্বার সঙ্গে ধাক্কা থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। কুয়াশা আর রাডার ডিটেকশনের ভয়ে তারা ওপরে উঠতে পারছিলেন না। এভাবেই তারা ডেমরার ক্রসিংয়ের কাছাকাছি পৌছলেন। শীতলক্ষ্যায় পৌছেই দক্ষিণমুখী টার্ন নিয়ে নদীর ওপর দিয়ে চলার কথা। আর যেই সেই টার্ন করলেন, সার্জেন্ট শহীদুল্লাহ এবার প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, ওপরের দিকে তাকিয়ে (তার দরজা ছিল খোলা) সৌভাগ্যবশত এবারও তারা (পানির সামান্য ওপর দিয়ে উড়ার সময়) অদেখা বৈদ্যুতিক তারের নিচ দিয়ে পেরিয়ে গেছেন। যা হয়নি, তা নিয়ে ভাববার অবকাশ ছিল না।

এবার একটু দৃঢ়স্বরে স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান সবাইকে হালকাভাবে শাসালেন 'শুধু সামনে দেখো, অযথা কথা নয়। আর পাঁচ সেকেন্ড, আমরা টার্গেট এলাকায় পৌছে গেছি, এয়ার গানার-রেডি? রকেট সিলেক্টর সিঙ্গেল' হঠাৎই যেন তাদের কপাল খুলে গেলো। চাঁদের আলোয় সবাই স্পষ্টই দেখলেন সামনে তেলের ট্যাংকগুলোকে। একটা সার্প-পুল করে অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল টার্ন নিয়েই সোজা ড্রাইভ দিলেন ট্যাংকমুখী। মনে হচ্ছিল, হয় রকেট খুঁজবে টার্গেট, না হয় জাহাজসুদ্ধ টার্গেটে। প্রথমবারের মতো দুটো সিঙ্গেল রকেট ছুড়লেন। মুহূর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা প্রায় জাহাজটাকে ঘিরে ফেললো, তারা টার্গেটের আগুনেই ধরা পড়ছিলেন প্রায়। আবার ঘুরে এলেন দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য। আবার লক্ষ্যভেদ হলো আরো একটা ট্যাংক। জ্বলে উঠলো সমগ্র এলাকা। 'গানার' অন্যান্য টার্গেটে ঘন ঘন তাক করলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিপ্রভার সঙ্গে নিচ থেকে এলো মেশিনগানের খই ফোটা আওয়াজের রিসেপশন। সমগ্র টার্গেট জ্বলে উঠলো। স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে শেষবারের মতো একটা সেলভো মেরে, মোড় ঘুরলেন ঘাঁটি অভিমুখে। এই শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনার মাঝে গানার তার দ্বিতীয় কাজ– এ ব্যান্ডেল পেম্পফ্লেট (PROPAGANDA PAMPHLET), রশির বাঁধন না খুলেই ফেলে দিলেন, বোধ হয় শীতলক্ষ্যার শান্ত শীতল জলে।

ফেরার পথে আখাউড়া এলাকা পার হওয়ার কালে আবারও পেলেন হালকা রিসেপশন। সাফল্যের আনন্দে নিচের আওয়াজ তাদের আর এবার বিচলিত করতে পারেনি। ফেরার পথে তাদের নেভিগেশন করতে হয়েছিল অতি সঠিকভাবে। আর নেভিগেশন সঠিক রাখা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘ তিন ঘন্টা মিশনের পর আর মাত্র ১২ থেকে ১৫ মিনিটের তেল অবশিষ্ট ছিল। অরণ্যঘেরা পাহাড়ি চূড়ায় কোনো নেভিগেশন যন্ত্র ছাড়া ঘাঁটি খুঁজে বের করা ছিল ভীষণ কষ্টসাধ্য। এর জন্য কতখানি উঁচু মানের পেশাগত দক্ষতার প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটু ভুল হলে বা ঠিক সময়ে হেলিপ্যাড খুঁজে না পেলে তেল ফুরিয়ে যেতো ঘোর অরণ্যের মাঝে– 'সব কিছুই যেন ঘড়ির কাঁটার মতো সমাপ্ত হয়েছিল'। মুক্তিবাহিনীর 'বিমানবাহিনীর' সদস্যদের অদম্য দেশপ্রেম আর সুউচ্চ পেশাগত জ্ঞান ও একনিষ্ঠতায়ই সম্ভব হয়েছিল এমন ঝুঁকিবহুল অপারেশনগুলো সম্পন্ন করা। এ দুটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ আক্রমণের সাফল্যের পরপরই বেজে উঠেছিল মিত্রবাহিনীর রণ-দামামা : পরদিন ভোর থেকে।

এভাবে ১৯৭১-এর ৪ ডিসেম্বরের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি যুদ্ধদানবদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর আত্মত্যাগী, তেজোদ্দীপ্ত ও নির্ভীক পাইলটদের প্রথম সফল অগ্রাভিযান সমাপ্ত হলো। মধ্যরাতে অধিকৃত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সার্থকভাবেই পরিচালিত এ দুটো বিমান

হামলা পরবর্তী মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এবার দিনের মধ্যে 'অ্যালুয়েট' এবং 'অটার' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বহু মিশন পরিচালিত করেছিল। এ মিশনগুলো কুমিল্লা ও সিলেট এলাকায় পলায়নমুখী পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষতি করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ঢাকা অভিমুখে পশ্চাৎপসরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে 'অ্যালুয়েটের' ক্রুরা কৈলা শহর থেকে আগরতলায় তাদের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়েছিলেন। আগরতলা থেকে তারা কুমিল্লা, নরসিংদী, দাউদকান্দি এবং অন্য সর্বত্রই পশ্চাৎপসরণকালে পাকিস্তানিদের ওপর বহু আক্রমণ পরিচালনা করেন। অভিযানগুলো পরিচালনার সময় হেলিকপ্টার শত্রুর বুলেটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর অনেকগুলোই ছিল মূল রোটর ব্লেডে। অলৌকিকভাবেই হেলিকপ্টার ও অটার ক্রুরা সে সব বিপজ্জনক আঘাতগুলো থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

একাত্তরের যুদ্ধে ঢাকায় পাকিস্তানি বিমানবাহিনী

পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি। তাদের ধারণা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা করলেই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা হবে। কারণ ভারত কখনো পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করবে না। ফলে একাত্তরের যুদ্ধকালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একটি মাত্র স্কোয়াড্রনই (নং ১৪ স্কোয়াড্রন, ঢাকা) অবস্থান করছিল। জানা তথ্য মোতাবেক তাতে সংযুক্ত ছিল : এফ-৮৬ স্যাবর উড়োজাহাজ-১৬টি, তার সঙ্গে কয়েকটি টি-৩৩, একটি পরিবহন বিমান ইত্যাদি। এদের সংখ্যা সঠিক জানা নেই। এ ছাড়া ঢাকায় বিমানবাহিনী ইস্টার্ন কমান্ডের কয়েকটি দপ্তর, একটি মোবাইল অবজারভার ইউনিট ও সিকিউরিটি ইউনিট ছাড়া বিমানবাহিনীর আর কিছুই ছিল না। এরই মাঝে স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ভারতীয় উন্নততর জঙ্গি জাহাজ মিগ-২১, এসইউ-৭. হান্টার ও ন্যাট জাহাজের দশটি শক্তিশালী স্কোয়াড্রনের বিরুদ্ধে সেই ডজন খানেক উড়োজাহাজের একটি মাত্র পাকিস্তানি ইউনিট নং ১৪ স্কোয়াড্রনকে লড়তে হয়েছিল।

ভারতীয়রা প্রথমে ন্যাট জাহাজ দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রথম ঘটনা ঘটে ২১ নভেম্বর ১৯৭১ সালে যখন ১০টি ন্যাট জাহাজের অতর্কিত আক্রমণের মুখোমুখি হয় তিনটি পাকিস্তানি স্যাবর এফ-৮৬ জেট। এ অভিযানে একটি ভারতীয় ন্যাট এবং দুটো পাকিস্তানি স্যাবর খোয়া যায়। ভারতীয়রা পুনঃ আক্রমণ পরিচালনা করে এসইউ-৭ এবং হান্টার উড়োজাহাজের সাহায্যে। এতে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দুটো হান্টার, একটি এসইউ-৭ এ এলাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সময় দীর্ঘায়িত হচ্ছে দেখে ভারতীয়রা পাকিস্তান বিমানবাহিনী ঘাঁটি ঢাকার ওপর এবার মিগ-২১ বিমানের আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র রানওয়েকে সম্পূর্ণ অকেজো করে ফেলে। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানিদের সর্বমোট প্রায় ১০টি স্যাবর জেট আকাশে ও ভূমিতে বিনষ্ট হয়। একটি পরিবহন বিমান এবং দুটো হালকা বিমানও ঘাঁটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয়দের পক্ষে অবশ্য আরো একটি হেলিকপ্টার পূর্বাঞ্চলের অপারেশনে বিধ্বস্ত হয়েছিল।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানিরা সব ঘাঁটি ইউনিট থেকে পালিয়ে যাওয়ার ফলে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ১৬ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত সব সামরিক যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে দিয়ে যায় বা মেরামতের অযোগ্যভাবে অকেজো করে রাখে। লক্ষ করা গেছে, বিমানবাহিনী ঘাঁটি ঢাকার এইচএফ যোগাযোগ কেন্দ্রে যন্ত্রপাতিসমূহ হাতুড়ি পিটিয়ে সম্পূর্ণ অকেজো করে রেখে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার লগ্নে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বরের ক্রান্তিলগ্নে বিমানবাহিনীর ভাগ্যে জুটেছিল বিধ্বস্ত/ব্যবহার অনুপযোগী রানওয়েসমূহ, বিধ্বস্ত এবং মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতি, ছয়টি

অকেজো স্যাবর জেট এফ-৮৬ ও একটি টি-৩৩ বিমান, বিমানবাহিনীর কুর্মিটোলা, ঢাকা এলাকায় কয়েকটি অফিস, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিত্যক্ত কয়েকটি রানওয়ে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুদ্ধক্লান্ত বিমানসেনা (অবশ্য পাকিস্তানে আটক ছিলেন আনুমানিক তিন হাজার বিমানবাহিনীর সদস্য) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজকীয় বিমানবাহিনীর কিছু রক্ষণাবেক্ষণ ঘাঁটি।

বিজয় দিবসের পর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর, আত্মসমর্পণের কিছুদিন আগে থেকে বিমানবাহিনীর চারজন অফিসার স্কোয়াড্রন লিডার হাবিবুর রহমান, স্কোয়াড্রন লিডার শামসুর রহমান ও স্কোয়াড্রন লিডার মঞ্জুরুল হক, লেফটেন্যান্ট নূরুল ইসলামকে ঢাকা সেনানিবাসের বন্দিদশা থেকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ মুক্তি দেয়। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিমানবাহিনীর সদস্যদের বিমানবাহিনী ঘাঁটি ঢাকায় একত্র হওয়ার আহ্বান জানানোর জন্য তারা সিদ্ধান্ত নেন। বেতারে আহ্বান প্রচারের পর উৎসাহব্যঞ্জক সাড়াও পাওয়া যায়। ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে কয়েকজন অফিসার ও বেশ কিছু বিমানসেনা সেনানিবাসের তেজগাঁও ফটক, সাধারণত যা থার্ড গেট নামে পরিচিত, সেখানে সমবেত হন। সে সময় শুধু স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান আর দুজন অফিসার ছাড়া বিমানবাহিনীর তদারকির কোনো অফিসার ছিলেন না। এর ভেতর স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ তাঁর সেক্টর থেকে ঢাকায় আসেন। তখন অফিসার মেসসহ বেশির ভাগ এলাকাই ভারতীয় বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ভারতীয় বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডর কিংলি ভারতের তরফ থেকে আঞ্চলিক বিমানের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বেস হেডকোয়ার্টার্সে তার দপ্তর বসান। পাশের টিনের ঘরগুলোতে বিমানবাহিনীর কিছু অফিস শুরু করেন। তেজগাঁও বেস-এর মেইন গার্ডরুম ও তার ভেতরকার সমগ্র এলাকায় তখন একত্র ছিল পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সদস্যরা। এমআই রুম (হাসপাতাল)-এর মেটারনিটি ওয়ার্ডে থাকতেন পিএনএফ-এর এয়ার অফিসার কমান্ডিং এয়ার কমোডর এনাম ও তার অফিসাররা। আর বেশির ভাগ বিমানসেনা থাকতো শাহীন স্কুলের ক্লাসরুমগুলোতে।

বিমানবাহিনীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মতো সে সময় কোনো রকম সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক অবয়ব ছিল না। হাতেগোনা মাত্র কজন অফিসারকে বিমানবাহিনী পরিচালনা করতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান, স্কোয়াড্রন লিডার ওয়াহিদুর রহমান, স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ, স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিন, স্কোয়াড্রন লিডার হাবিবুর রহমান, স্কোয়াড্রন লিডার শামসুর রহমান, স্কোয়াড্রন লিডার মঞ্জুরুল হক, স্কোয়াড্রন লিডার হাসানুজ্জামান এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের ছিলেন অন্যতম। সাধারণ আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবাহিনীর যত সদস্য তখন উপস্থিত ছিলেন, তাদের আহার ও বাসস্থানের সংকুলান করাই তাদের সামনে তখন মুখ্য দায়িত্ব হিসেবে প্রতিপন্ন হলো। প্রকট বাসস্থান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিমানবাহিনীর সদস্যদের সাময়িক কিছু সময়ের জন্য স্বীয় উদ্যোগেই আবাসিক সংকুলান করতে বলা হলো। যারা বাসস্থান সংকুলানে ব্যর্থ হলেন তাদের তেজগাঁও বিমানসেনা মেসে সংকুলান করা হলো। এরপর খাদ্য সরবরাহ ছিল পরবর্তী জরুরি সমস্যা। ক্যাটারিং গুদামে মজুদ যে খাদ্য ছিল তাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণের পর বিষ মিশিয়ে রেখেছে গুজবের ফলে কেউ সে খাবারে হাত দিতে সাহস করেনি। অসংখ্য অসুবিধার ভেতরেই রন্ধন উপকরণ সরঞ্জাম ও বাসনপত্র কেনার জন্য সামান্য অর্থ সংকুলান সম্ভব হলো। কেন্দ্রীয় রেশন ভাণ্ডার থেকে সামান্য পরিমাণ খাদ্য সামগ্রীও সংগ্রহ হলো। ১৮ ডিসেম্বর স্কোয়াড্রন লিডার

সুলতান ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (অব.) খলিলের সাহায্যে খাওয়ার বন্দোবস্ত করলেন জনা পঞ্চাশেক এক বেস-থাকা বিমানসেনার জন্য। তারা তখন থাকতেন পুরোনো সংসদ-এর পাশে বিমানবাহিনীর চারটি টি-কোয়ার্টারে। তারপর সদরঘাট এলাকার একজন রেস্তোরাঁর মালিক খাওয়ালেন আরো দুদিন।

এই করে গড়েছিল বিমানবাহিনীর অঙ্কুর। অল্প কিছু দেশপ্রেমিক ত্যাগী সদস্যই সেদিনের বিমানবাহিনীকে এগিয়ে নিয়েছিলেন ধীরে ধীরে। এক-এক করে নিজ হাত দিয়ে রানওয়ে আর ঘাঁটি এলাকাকে বোমা, মাইন আর ধ্বংসস্তূপ থেকে পরিষ্কার করেন এবং পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নেতাদের প্রবাস থেকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। সপ্তাহ খানেকের ভেতর বিভিন্ন সেক্টর ও এলাকা থেকে অনেক সদস্যই এসে সমবেত হন। তাদের জন্য বাসস্থান ও খাদ্য সংকুলান করা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আত্মসমর্পণের আগেই পাকিস্তানিরা সব যুদ্ধবিমান ও সরঞ্জামাদি হয় ধ্বংস নতুবা অকেজো করে রেখে গিয়েছিল। ব্যবহার অনুপযুক্ত বিমান ও সরঞ্জামগুলোকে একত্রে স্তূপীকৃত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার বিমানবাহিনী ঘাঁটি ঢাকায় এলেন কলকাতা থেকে। অনুষ্ঠান শেষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও এয়ার কমোডর কিংলি ইন্ডিয়ান বিমানবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আলোচনায় মিলিত হন। মিত্র সেনারা ভারতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এয়ার কমোডর কিংলিকে ঘাঁটি সদর দপ্তরে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর পরিত্যক্ত অপারেশন কক্ষ, হো চি মিন রাস্তার পাশে ও নং ১৪ স্কোয়াড্রনে ক্ষুদ্রাকার বিমানবাহিনীর সদর দপ্তর ও ফ্লাইং উইং স্থাপন করা হলো।

যুদ্ধ থেকে ফিরে কিছুসংখ্যক অফিসার ঢাকা ঘাঁটিতে উপস্থিত হলেন। তাদের আগমনে তিনটি ফ্লাইং স্কোয়াড্রন এবং একটি ফ্লাইং উইং গঠিত হলো। স্কোয়াড্রন লিডার মঞ্জুরুল হক ফ্লাইং উইংয়ের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। স্কোয়াড্রন লিডার মঞ্জুরুল হক ফ্লাইং উইংয়ের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদকে নং ৫০১ হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন অধিনায়ক, স্কোয়াড্রন লিডার ওয়াহিদুর রহমানকে নং ৫০৩ পরিবহন স্কোয়াড্রনের এবং স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিনকে নং ৫০৭ ফাইটার স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হলো। পুরোনো নং ১৪ স্কোয়াড্রনের টিনের বিল্ডিং হলো কিছুদিনের জন্য সব স্কোয়াড্রনের স্থান।

সেনানিবাস সড়কের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হ্যাঙ্গারে তিনটি হেলিকপ্টারের সমন্বয়ে গঠিত হলো নং ৫০১ হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন। এ হ্যাঙ্গারটিতে পাকিস্তানিরা হেলিকপ্টার অপারেশন করতো। পরবর্তীকালে এর নাম রাখা হয় 'চপার্সডেন'। হ্যাঙ্গারটির মালিকানা নিয়ে সেনা ও বিমানবাহিনীর মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বিষয়টির যুক্তিসঙ্গত মীমাংসার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেন এবং পরে 'চপার্সডেন' বিমানবাহিনীকে দেওয়া হয়। নং ৫০৩ স্কোয়াড্রন থেকে গেলো পুরোনো নং ১৪ স্কোয়াড্রন বিল্ডিংয়ে এবং নং ৫০৭ স্কোয়াড্রন স্থাপন হলো এ ও ডির উল্টো দিকে একটি বিল্ডিংয়ে, যেটা পরে ওসি মেইনটেন্যান্স-এর অফিস হলো।

নিকটস্থ জঙ্গল ও পুকুরগুলোতে অসংখ্য ভগ্নাংশ, ভূমি সরঞ্জাম, ক্ষুদ্রাস্ত্র এবং যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এ পরিত্যক্ত স্থানসমূহে পাকিস্তানিরা পলায়নের পূর্বে মূল্যবান সামগ্রীগুলো ছুড়ে ফেলে যায়। এ স্থানগুলোকে তারা ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির খনিতে রূপান্তরিত করেছিল। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে দক্ষ কর্মীরা এ স্থানগুলো থেকে অসংখ্য খুচরা যন্ত্রপাতি, ভূমি সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশসহ দুটো অরেন্ডা ইঞ্জিন উদ্ধার করলেন। কতিপয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-যন্ত্রপাতি স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয় করা হলো। ঐ পরিত্যক্ত যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি নিয়েই যান্ত্রিক কর্মীরা

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানগুলো মেরামতের প্রত্যয়ে ব্রতী হলেন। তারা এই অল্প সংখ্যক বিমানকে কর্মক্ষম করার প্রচেষ্টায় রাত-দিন বিরামহীনভাবে কাজ করলেন।

তাদের বিরামহীন প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফলে মাত্র এক মাসের মধ্যেই একটি টি-৩৩ এবং তিনটি এফ-৮৬ বিমানকে বিভিন্ন বিমানের সরঞ্জাম মিলিয়ে কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব হলো। প্রথম বিমানটি একটি টি-৩৩, ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি সর্বপ্রথম বাংলার আকাশে উড়লো। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার সর্বপ্রথম বিমানটিতে আকাশে ওড়েন। বিমানবাহিনীর ইতিহাসে সে দিনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এর মধ্যে সেনানিবাসের মধ্য থেকে স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান একদিন একটি অ্যালুয়েট পেলেন, বিডিএফ হেডকোয়ার্টার্সের পেছনে গাছতলা থেকে। তাকে টেনে আনা হলো তেজগাঁও। অল্প কিছু কাজের পর তাকে উড্ডয়নযোগ্য করা হলো। কিছুদিনের ভেতর একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলো। জেনারেল ওসমানী দেশে ফেরার পর প্রথমে বেইলি রোডের একটি বাড়িতে ও তারপর সিএমএইচ-এর পাশে বিমানবাহিনী হেডকোয়ার্টার্স হলো বাংলাদেশ ফোর্সের সদর দপ্তর। সেখানে কিছুদিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন তোয়াব বিদেশ থেকে ফেরার পর, তাকে অপারেশনস ও প্লানস-এর ডাইরেক্টর নিয়োগ করা হলো। বিমানবাহিনী সদর দপ্তর স্থাপন হলো প্রথমে তেজগাঁও বেস, হো চি মিন রাস্তার ধারে, কিলার কন্ট্রোলের নিচে, অপারেশন রুমের ভেতর। এরপর বেস সদরে ওসি এডমিন বসলেন। পরে সেখানে ওসি এডমিন অফিস হলো।

সরকারিভাবে গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার বিমানবাহিনী প্রধান ছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ঘাঁটি কার্যক্রমেও সমন্বয় করতেন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ঘাঁটি প্রথম নিত্যক্রম আদেশ ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। সে সময় তার সঙ্গে কাজ করার জন্য মাত্র একজন স্টাফ অফিসারই ছিলেন। তিনি ছিলেন আবহাওয়া ব্রাঞ্চের উইং কমান্ডার কামাল উদ্দিন। কতিপয় অপ্রীতিকর কিছু বিষয় সে সময় বিমানসেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সীমান্ত রণাঙ্গনে যেসব সদস্য যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের উচ্চতর পদ প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। সে অনুসারে ঘাঁটিতে পদার্পণ করেই তারা সেসব সুযোগ-সুবিধার দাবি উত্থাপন করে বসেন। সম্পদ ও সঙ্গতির স্বল্পতাহেতু সেসব দাবির তাৎক্ষণিক পূরণ সম্ভব ছিল না। তবু এসব অসুবিধা ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে হলো এ নবীন বিমানবাহিনীকে।

স্বাধীনতাযুদ্ধকালে রানওয়েগুলোর, এমনকি ট্যাক্সি ট্রাকগুলোর সাংঘাতিক ক্ষতিসাধিত হয় এবং অপারেশনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যত শিগগির সম্ভব রানওয়ের জরুরি ব্যবহারের জন্য মেরামতের কাজ তড়িঘড়ি করে হাতে নেওয়া হয়। এতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে এত তাড়াহুড়োর মাঝে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং মেরামতের কাজ সঠিকভাবে না হওয়ায়, বম্ব ক্রেটারগুলো মাঝেমধ্যে ধসে পড়ে। শুধু রানওয়ে নয়, ট্যাক্সিওয়ে ও এপ্রোনগুলোও বেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তেজগাঁও রানওয়েতে অনেকগুলো গর্ত থাকায় এখানে শুধু হেলিকপ্টার অপারেশন করা যেতো। স্কোয়াড্রন লিডার সুলতানের প্রথম দল প্রথমে ট্যাক্সিওয়েটাকে সংস্কার ও মাইনমুক্ত করে। প্রায় সবাই মিলে অন্যান্য কাজের ফাঁকে নিজ হাতে সব ইটপাটকেল সরাতে হয়েছিল। ১৮ ডিসেম্বরে ট্যাক্সিওয়ে পরিষ্কার করে, প্রথমে অটার জাহাজটিকে ল্যান্ড করানো হয়, হেলিকপ্টারের রেডিওকে চলমান টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপর এটিসির যন্ত্রপাতিকে ব্যবহারযোগ্য করা হয়। তার দরজা-জানালা সব ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল। আর অকেজো ছিল সব যন্ত্রপাতি। শূন্য থেকে শুরু হয়েছিল সিভিল এভিয়েশনকে গড়া। প্রথম ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হলেন উইং কমান্ডার মির্জা (অব.)। যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও ভারতীয়

বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের সাহায্যে গড়ে উঠলো বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল।

শিগগিরই ঢাকা সেনানিবাসে বিমানবাহিনী সদর দপ্তর বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হলো। জেনারেল এম এ জি ওসমানী সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তখন তিনি ধারণা করতেন বাংলাদেশের একটিই মাত্র সশস্ত্র বাহিনী থাকবে এবং স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচিত হবে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার, উইং কমান্ডার বাশার, স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান, স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ ও বিমানবাহিনীর অফিসারবৃন্দ তিনটি সার্বভৌম বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তাদের মতামত প্রকাশ ও প্রত্যয় ঘোষণা করলেন। স্থলবাহিনীর অনেক জ্যেষ্ঠ অফিসার একীভূত সশস্ত্র বাহিনী গঠনে জেনারেল ওসমানীর ধারণাকে সমর্থন দিচ্ছিলেন। বহু আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের পর চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হলো যে দেশে তিনটি সার্বভৌম বাহিনী হবে এবং প্রত্যেকটি সংগঠনের প্রধান, বাহিনী প্রধান নামে অভিহিত হবেন এবং সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। বিমানবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য যুদ্ধকালীন বন্ধু দেশগুলো এগিয়ে এলো। এ সময়ের মধ্যে আরো কিছু অফিসার ও বিমানসেনা যারা গ্রামগঞ্জে ছিলেন বিমানবাহিনীর সদরে রিপোর্ট করলেন। সেই প্রাথমিক সময়ে সবাই কাজ করছিলেন নিবেদিতপ্রাণ হয়ে। তবে কিছুসংখ্যক বিমানসেনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। যেমন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সার্জেন্ট রহমান (এন সিও আই সি/এফ-৮৬), সার্জেন্ট ইসমাইল (প্রভোস্ট), কর্পোরাল হাসমত ও ফ্লা: সা: আলাউদ্দিন (৫০১ স্কোয়াড্রন), ফ্লা: সা: আসগর (কিলো ফ্লাইট) এবং ফ্লা: সা: রোস্তম (৫০৩ স্কোয়াড্রন)।

১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারির শেষার্ধে জেনারেল সিজোফের (CEJOPH) নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি দল বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে বিমান, এয়ার ডিফেন্স রাডার ও সরঞ্জাম প্রদানের প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে আসে। সে সময় একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই বাংলাদেশে বিশাল আকারে সামরিক সহায়তা দানে এগিয়ে আসে। বিমানবাহিনী প্রাথমিকভাবে একটি ফাইটার স্কোয়াড্রন, একটি হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন, ছোট আকারের পরিবহন বিমানের ইউনিট এবং বিমান প্রতিরক্ষা রাডার ব্যবস্থা সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের পর, সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক দল ১০টি মিগ-২১ বিমান, পাঁচটি এমআই-৮ হেলিকপ্টার, তিনটি পরিবহন বিমান (একটি ভিআইপি ব্যক্তিবর্গ বহনকারী এ এন ২৪ বিমান এবং দুটি এ এন-২৬ বিমান), শক্তিশালী দুটি রাডার, দুটি নিচুতে দেখা রাডার এবং এতদসংক্রান্ত ভূমি সরঞ্জামাদি প্রদানে সম্মত হয়। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য ২০০ জন উপদেষ্টা প্রদানেও সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক দল আগ্রহ প্রকাশ করে। বিমান সদর চারটি দল এবং প্রতি দলে সর্বাধিক সংখ্যায় ১০ জন বিশেষজ্ঞ গ্রহণে সম্মত হলো। একই সঙ্গে তারা বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অফিসার ও বিমানসেনাদের যুদ্ধসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে যথেষ্ট সহায়তা দেয়।

এর মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অফিসার ও বিমানসেনাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব আসে। যদিও বিমানবাহিনীতে বেশ কিছুসংখ্যক বিমান পরিচালনা হতো, তথাপিও তার প্রয়োজনীয়সংখ্যক যান্ত্রিক কারিগরের অভাব ছিল তখন প্রকট। ভারত তিনটি অ্যালুয়েট-III, একটি অটার বিমান দেয়। এর কিছু পরেই যুক্তরাজ্যও দুটি ওয়েসেক্স (WESSEX) হেলিকপ্টার প্রদান করে প্রধানমন্ত্রীকে।

এ সময় পরিবহন সমস্যাই দেখা দেয় মারাত্মক আকারে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর তখন বিমান টেনে নেওয়ার জন্য মাত্র দুটো ট্রাক্টরই সম্বল ছিল। আর যেখানে যা পাওয়া গেলো তা দিয়েই তখন সদস্যদের কাজ করতে হলো। ট্রাক্টর দুটো তখন কর্মচারী এবং সরঞ্জাম বহনে ব্যবহার করা হতো। উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে উত্তর সীমান্তে ৩ টনি যে ট্রাকগুলো তিনি ব্যবহার করতেন, সেগুলো বিমানবাহিনীর জন্য নিয়ে আসেন। কিছুদিনের দৈন্যতার পর বিমানবাহিনী ভারত থেকে বেশ কটি মহেন্দ্র জিপ গাড়ি ক্রয় করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কয়েকটি জিপ স্টার এবং একটনি ট্রাক সাহায্য হিসেবে পায়। এ দিয়ে শুরু হয় যানবাহনের বহর।

১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে আরো কয়েকজন অফিসার বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। তার মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এবং কজন পাকিস্তানের বন্দিশিবির থেকেও পালিয়ে আসেন। তাই প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠনে যারা আত্মনিয়োগ করলেন তারা হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন কে এম আমিনুল ইসলাম, উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার, উইং কমান্ডার কামাল উদ্দিন, স্কোয়াড্রন লিডার মঞ্জুরুল হক, ওয়াহিদুর রহমান, শামসুর রহমান, সদরুদ্দিন, সুলতান মাহমুদ, হামিদুল্লাহ, হাবিবুর রহমান, বদিউর রহমান, হাসানুজ্জামান, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ফজলুর রহমান, কামালউদ্দিন, লিয়াকত, বদরুল আলম, শামছুল আলম, কাদের, ইসলাম, ইরফান, আয়ুব, আশরাফ ও রউফ, ফ্লাইং অফিসার ফজলুর রহমান, সাখাওয়াত, কামাল, মির্জা ও ইকবাল রশিদ এবং পাইলট অফিসার খলিল প্রমুখ বরেণ্য অফিসার।

আত্মসমর্পণের পূর্বে পাকিস্তানি সৈন্যরা মিরপুরেব প্রেসি রাডার কেন্দ্রটি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করে। কতিপয় অফিসার ও বিমানসেনার সহযোগিতায় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কামাল উদ্দিন রাডার কেন্দ্রটি সংস্কার সাধন করেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়েও ঢাকার ব্রিটিশ কূটনৈতিক মিশন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীকে কারিগরি সামগ্রী প্রদানের সাহায্য বর্ধিত করে। শিগগিরই আকাশ প্রতিরক্ষা পরিচালনা কেন্দ্র তার কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৭২-এর ১২ মার্চের মধ্যে মিরপুর রাডার ইউনিট তার কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী একটা ছোট অথচ মনোজ্ঞ ফ্লাই পাস্ট প্রদর্শন করে সবাইকে বিস্ময়াভিভূত করে। কয়েকটি বিমানের ঝাঁক সুন্দর (FORMATION) উড়ে যায় নীল আকাশের বুক চিরে। তার মধ্যে ছিল দুটি এফ-৮৬, একটি টি-৩৩, তিনটি অ্যালুয়েট ও একটি অটার বিমান। রমনা মাঠে সেদিন ছিল বাঙালির গর্বভরা বুক, উন্নত শির ও স্বাধীনতার স্বাদ।

দিন পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিমানবাহিনী সদর দপ্তরেও ব্যস্ততা বাড়লো। তেজগাঁও বিমান ঘাঁটি পরিচালনা ও দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার। অন্য অফিসাররা এগিয়ে এলেন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে। কিছুদিন পর বিমান ও যন্ত্রাংশ আনয়ন ও প্রশিক্ষণার্থে বেশ কিছু অফিসার ও বিমানসেনা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে যান, তখন বিমানবাহিনী পুনরায় জনশক্তিস্বল্পতার তীব্রতর সমস্যায় পতিত হলো। এ সমস্যাসংকুল অবস্থা ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে অফিসার ও বিমানসেনাদের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন অবধি বিরাজ করছিল। এ সময় বিমানবাহিনীর অগ্রযাত্রা ছিল কিছু মন্থর।

(১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রকাশ করা 'বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস' শীর্ষক বই থেকে)

কিলো ফ্লাইটের : মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

কর্মকর্তা

স্কো: লি.	সুলতান মাহমুদ	জিডি (পি)
ফ্লা: লে:	সামসুল আলম	জিডি (পি)
ফ্লা: লে:	বদরুল আলম	জিডি (পি)
ক্যাপ্টেন	খালেক	অবসরপ্রাপ্ত পাইলট (পিআইএ)
ক্যাপ্টেন	শাহাবুদ্দিন	ঐ
ক্যাপ্টেন	আকরাম	ঐ
ক্যাপ্টেন	শরফুদ্দিন	ঐ
ক্যাপ্টেন	কাজী আবদুস সাত্তার	ঐ
ক্যাপ্টেন	আব্দুল মুকিত	ঐ

বিমানসেনা

ফ্লা: লে:	আলী আজগর	রেডিও ফিটার
সার্জেন্ট	এম এ হালিম	এয়ারফ্রেম ফিটার
সার্জেন্ট	কাদের	এয়ারফ্রেম ফিটার
সার্জেন্ট	এ হোসেন সরকার	এয়ারফ্রেম ফিটার
সার্জেন্ট	কাজী এম আহম্মদ	ইঞ্জিন ফিটার
সার্জেন্ট	এ লতিফ মজুমদার	এয়ারফ্রেম ফিটার
সার্জেন্ট	আখতার উদ্দিন	রেডিও ফিটার
সিনিয়রটেক	আব্দুল আওয়াল	এয়ারক্রাফট ফিটার
সিনিয়রটেক	সিরাজুল হক	এয়ারক্রাফট ফিটার
সিনিয়রটেক	খলিলুর রহমান	আর্মামেন্ট ফিটার
সিনিয়রটেক	এম হক শরীফ	আর্মামেন্ট ফিটার
সিনিয়রটেক	আব্দুল খালেক	ক্লার্ক সেক
সার্জেন্ট	সহিদুল্লাহ	আর্মামেন্ট ফিটার
কপলটেক	হাসমতুল্লাহ	এয়ারক্রাফট ফিটার
কপলটেক	কামাল উদ্দিন	রেডিও ফিটার
কপলটেক	এস ইসলাম চৌধুরী	আর্মামেন্ট ফিটার
কপল	নূর মোহাম্মদ	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
কপলটেক	কামাল উদ্দিন আহমেদ	
কপল	লুৎফর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
কপল	রহমত উল্লাহ	এয়ারক্রাফট ফিটার
কপল	এম আলী আকবর	এয়ারক্রাফট ফিটার
কপল	আব্দুর রব	এমটি এফ
কপল	এ করিম	এমটিডি
কপল	ফরিদ আখতার	এমটিডি
কপল	এ রশীদ	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
কপল	মঈন উদ্দিন	অয়্যারলেস ফিটার

কপল	মুনির আহমেদ	আর্মামেন্ট ফিটার
কপল	হক	আর্মামেন্ট ফিটার
জেটি	আবু তাহের	এয়ারক্রাফট ফিটার
জেটি	সাহাবুদ্দিন	এয়ারক্রাফট ফিটার
জেটি	নূর উদ্দিন আহমেদ	এয়ারক্রাফট ফিটার
জেটি	হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার
জেটি	খলিলুর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
জেটি	আব্দুল আজিজ খান	এয়ারক্রাফট ফিটার
জেটি	শহিদুল্লাহ	এয়ারক্রাফট ফিটার
জেটি	এম এম ইসলাম ভূইয়া	এয়ারক্রাফট ফিটার
এলএসি	সাদেক হোসেন	এয়ারক্রাফট ফিটার
এলএসি	ফারুক	এয়ারক্রাফট ফিটার
এলএসি	আব্বাস খান	আর্মামেন্ট ফিটার
এলএসি	হান্নান	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
এলএসি	আবু সাফা	এয়ারক্রাফট ফিটার
এলএসি	রবিউল আওয়াল	এয়ারক্রাফট ফিটার
এলএসি	হাফিজ আহমেদ	এয়ারফ্রেম ফিটার
এলএসি	রুস্তম আলী	আর্মামেন্ট ফিটার
এলএসি	মোজাম্মেল হক	ইলেকট্রিক ফিটার
এলএসি	আশরাফ উদ্দিন	এয়ারফ্রেম ফিটার
এলএসি	সাইফুল্লাহ	ইনস্ট্রুমেন্ট ফিটার

বিমানবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

এয়ার ভাইস মার্শাল	আব্দুল করিম খন্দকার, বি ইউ পিএসসি	জিডি (পি)
এয়ার ভাইস মার্শাল	এম খাদেমুল বাশার বি ইউ	জিডি (পি)
এয়ার ভাইস মার্শাল	সদরুদ্দিন বিপি	জিডি (পি)
এয়ার ভাইস মার্শাল	কে এম আমিনুল ইসলাম পিএসসি	জিডি (পি)
এয়ার ভাইস মার্শাল	সুলতান মাহমুদ বি ইউ পিএসসি	জিডি (পি)
গ্রুপ ক্যাপ্টেন	সামছুল আলম বি ইউ পিএসসি	জিডি (পি)
উইং কমান্ডার	সৈয়দ এম ওয়াহিদুর রহিম	জিডি (পি)
উইং কমান্ডার	এম হামিদুল্লাহ খান বিপি	এঅ্যান্ডএসডি
উইং কমান্ডার	জি এস মিরজা	এমটি সিগস
উইং কমান্ডার	টি এ এম আশরাফুল ইসলাম, পিএসসি	এঅ্যান্ডএসডি
উইং কমান্ডার	এ টি এম আতাউর রহমান পিএসসি	হিসাব
উইং কমান্ডার	আব্দুর রউফ	এমটি সিগস
গ্রুপ ক্যাপ্টেন	এম ফজলুল হক	এমটি আর্মামেন্ট
উইং কমান্ডার	এম হাবিবুর রহমান	এম ইকুপ্ট
উইং কমান্ডার	কামাল উদ্দিন আহমেদ	এঅ্যান্ডএসডি
উইং কমান্ডার	সাখাওয়াত হোসেন খান	জিডি (পি)
উইং কমান্ডার	এম অলিউল্লাহ	এমটি সিগস
উইং কমান্ডার	এম খলিলুর রহমান	এমটি সিগস
উইং কমান্ডার	এম আঃ কুদ্দুস পিএসসি	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	এ এইচ এম সোয়েব	এঅ্যান্ডএসডি (সিঅ্যান্ডআর)
স্কোয়াড্রন লিডার	এম আবুল কালাম	এমটি ইঞ্জ

স্কোয়াড্রন লিডার	নূরুল কাদের	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	বদরুল আলম বি ইউ	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	লিয়াকত আলী খান বি ইউ	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	এ কে এম ফজলুর রহমান	এমটি ইঞ্জ
স্কোয়াড্রন লিডার	এম আবু জাফর	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	এম মাজহারুল হক চৌধুরী	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	মীর আলী আকবর	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	খন্দকার ইফতেখার আহমেদ	এমটি ইঞ্জ
স্কোয়াড্রন লিডার	এম আবুল কালাম আজাদ	এমটি সিগস
স্কোয়াড্রন লিডার	জিল্লুর রহমান	এমটি ইঞ্জ
স্কোয়াড্রন লিডার	সৈয়দ নূরুল হুদা	এমটি ইঞ্জ
স্কোয়াড্রন লিডার	ও ওয়াই এম নাজমুল হক	?
স্কোয়াড্রন লিডার	নূরুল ইসলাম এম ফেরদৌস হোসেন	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	এম কামরুজ্জামান	জিডি (পি)
স্কোয়াড্রন লিডার	শাহ মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান	জিডি (পি)
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	মতিউর রহমান বীরশ্রেষ্ঠ	জিডি (পি)
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	কিউ এস এম ইকবাল রশীদ	জিডি (পি)
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	মীর মাহমুদুল হক	জিডি (পি)
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	আহমেদ বদরুল হোসেন	হিসাব
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	এম এ রাজ্জাক	এম ইকুপ্ট
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	এম মোস্তাফিজুর রহমান	এঅ্যান্ডএসডি (সিঅ্যান্ডআর)
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	কে এম আলী মুনির রানা	জিডি (এন)
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	এম আমিরুল ইসলাম	জিডি (পি)
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	ফিরোজ আখতার	মেট

বিমানসেনা

১।	৫২৫৯৩	ফ্লা:সা:	আব্দুল জলিল	এয়ারক্রাফট ফিটার
২।	৫৪০৪৩	ও:অ:এম	হাবিবুর রহমান খান	সাপ্লাই অ্যাসি
৩।	৫৪০৮০	ফ্লা: সা:	এ এস এম হাবিবুর রহমান	সেক: অ্যাসি:(জিডি)
৪।	৫৪০৯৮	মা:ও:অ	নূরুল ইসলাম	ঐ
৫।	৫৪১৮৪	ও:অ:	আলতাফুর রহমান	মেডি: অ্যাসি
৬।	৫৪১৯০	"	এম আলিম উল্লাহ	জিএস-১
৭।	৫৪২৯১	"	এম ওমর আলী	"
৮।	৫৪৩৬৯	"	শামছুল হক	ক্যাট: অ্যাসি:
৯।	৫৫০২৩	মা:ও:অ	রেজাউল মোস্তফা চৌধুরী	রেডিও ফিটার
১০।	৫৫০৫৬	ফ্লা:সা:	এম আব্দুল হালিম	এয়ারক্রাফট ফিটার
১১।	৫৫০৮৩	"	আব্দুল করিম ভুইয়া	সাপ্লাই অ্যাসি
১২।	৫৫১০৫	"	বসির উদ্দিন আহমেদ	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
১৩।	৫৫১০৭	"	মোহাম্মদ ইছহাক	
১৪।	৫৫১৬৯	ও: অ:	এম আব্দুল হালিম	এফসিও
১৫।	৫৫১৭০	"	মোহাম্মদ উল্লাহ	সেক: অ্যাসি: (জিডি)
১৬।	৫৫১৯৫	ফ্লা:সা:	এম ইসকান্দার আলী	সেক: অ্যাসি: (এ)
১৭।	৫৫৩৭২	"	বদিউজ্জামান	এয়ারক্রাফট ফিটার

১৮।	৫৫৪২২	"	আব্দুল মজিদ	জিএস-১
১৯।	৫৫৪৪১	ও:অ:	গোলাম মোস্তফা	এটিসি
২০।	৫৫৪৪৩	সার্জেন্ট	আব্দুল লতিফ হাজরা	জিএস-১
২১।	৫৫৪৮২	ফ্লা: সা:	সেখ আহমেদ	"
২২।	৫৬২৪৮	মা:ও:অ	মফিজুল ইসলাম	রেডিও ফিটার
২৩।	৫৬৫৪০	"	এম মোখলেছুর রহমান	সাপ্লাই অ্যাসি
২৪।	৫৬৬০৭	ও:অ:	জয়নুল আবেদীন	সেক: অ্যাসি: (এ)
২৫।	৫৬৬২১	ফ্লা:সা:	আবুল হাসেম খান	এটিসি
২৬।	৫৬৬৬১	ও: অ:	ওয়াহিদুর রহমান	এমটিডি
২৭।	৫৬৬৮৯	"	আব্দুল খালেক	সাপ্লাই অ্যাসি:
২৮।	৫৬৭০০	ফ্লা: সা:	মকবুল আহমেদ	জিএস-১
২৯।	৫৭৫৫১	সার্জেন্ট	সুলতান আহমেদ	এমটিডি
৩০।	৫৭৫৯৫	মা:ও:অ:	আলতাফ হোসেন	সাপ্লাই অ্যাসি:
৩১।	৫৭৬৩১	"	সিকান্দার আলী চৌধুরী	এমটিডি
৩২।	৫৭৬৩৩	ফ্লা:সা:	মজিবুর রহমান আনসারী	জিএস-১
৩৩।	৫৭৬৬০	ও:অ:	এ কে এম আব্দুর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩৪।	৫৭৮১২	ফ্লা:সা:	এম এম মোহাম্মদ আব্বাস	জিএস-১
৩৫।	৫৭৮১৩	মা:ও:অ:	আব্দুল মান্নান	আর্ম: ফিটার
৩৬।	৫৭৮২৩	"	শওকত আলী	প্রভোস্ট
৩৭।	৫৭৮৯৯	ও:অ:	আবু আহমেদ মজুমদার	সেক: অ্যাসি: (এ)
৩৮।	৫৮১৭৫	"	সুলতান হোসেন	এয়ার সিগ
৩৯।	৫৯৩২৭	সার্জেন্ট	আব্দুল মান্নান	জিএস-১
৪০।	৬২৭৯১	ফ্লা:সা:	মোহাম্মদ আলী	এমটিডি
৪১।	৬৩৯৬০	ও:অ:	সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	এফসিও
৪২।	৬৪৮৭১	ফ্লা:সা:	আব্দুল হান্নান	এমটি ফিটার
৪৩।	৭০০৬৮	ফ্লা:সা:	আব্দুল জলিল	এমটি ফিটার
৪৪।	৭০০৮৭	ও:অ:	এম ইউনুস মিয়া	জিএস-১
৪৫।	৭০১০২	মা:ও:অ:	আব্দুল খালেক	জিএস-১
৪৬।	৭০১৭২	ফ্লা:সা:	এম এ মতিন খান	"
৪৭।	৭০২৫৭	মা:ও:অ:	মসিউর রহমান	সাপ্লাই অ্যাসি:
৪৮।	৭০৩০৩	ফ্লা:সা:	এম নূরুল হক	জিএস-১
৪৯।	৭০৩৬৯	"	এ এফ এম বজলুল হক	"
৫০।	৭০৩৭৯	মা:ও:অ:	আব্দুল মজিদ মিয়া	এমটি ফিটার
৫১।	৭০৪১৪	ও:অ:	মনসুর আহমেদ	মেট: অ্যাসি
৫২।	৭০৪১৮	ও:অ:	এ এস এম লিয়াকত উল্লাহ	জিএস-১
৫৩।	৭০৪২২	মা:ও:অ:	মকবুল আহমেদ	এমটি ফিটার
৫৪।	৭০৪২৪	ও:অ:	খুরশিদ আলম	এয়ারকক্রাফট ফিটার
৫৫।	৭০৪২৬	ফ্লা:সা:	শামছুল হক ভুইয়া	এমটিডি
৫৬।	৭০৪৩৯	মা:ও:অ:	টিপু সুলতান চৌধুরী	জিএস-১
৫৭।	৭০৪৫০	সার্জেন্ট	এম তাজুল ইসলাম	এমটি ফিটার
৫৮।	৭০৪৬৪	ফ্লা:সা:	আলী আশরাফ	জিএস-১
৫৯।	৭০৪৬৯	ও:অ:	মনিরুল ইসলাম	এয়ারক্রাফট ফিটার
৬০।	৭০৫৫৩	"	আব্দুল আওয়াল ভুইয়া	রেডিও ফিটার

৬১।	৭০৫৬০	মা:ও:অ	আব্দুল মালেক	জিএস-১
৬২।	৭০৬১৪	ও:অ:	এম মোখলেছুর রহমান	এলএসইডাব্লিও
৬৩।	৭০৬৬৫	মা:ও:অ	গোলাম কিবির	মেডি: অ্যাসি:
৬৪।	৭০৬৭৭	ফ্লা:সা:	আবুল হোসেন ভুইয়া	সাপ্লাই অ্যাসি
৬৫।	৭০৬১৬	মা:ও:অ:	এম আলী আজগর	রেডিও ফিটার
৬৬।	৭০৭৪০	ও:অ:	মোহাম্মদ আব্দুল্লা	জিএস-১
৬৭।	৭০৭৭৭	"	গোলাম রহমান	জিসি
৬৮।	৭০৭৮১	ফ্লা:সা	মোফাজ্জল আহমেদ	এমটিডি
৬৯।	৭০৮২৯	ও:অ:	এম ছালামত উল্লাহ	এয়ার সিগ
৭০।	৭০৮৯৬	ফ্লা:সা:	আব্দুস ছাত্তার চৌধুরী	এমটিডি
৭১।	৭০৯৪৬	ও:অ:	মোহাম্মদ ইব্রাহীম	"
৭২।	৭০৯৭৩	"	শামছুল হক	এডমিন অ্যাসি
৭৩।	৭১০৭৩	ফ্লা:সা:	এম শহিদউল্লাহ	আর্ম: ফিটার
৭৪।	৭০৭২৩	ও:অ:	সৈয়দ ছাইদুর রউফ	জিএস-১
৭৫।	৭১০৯০	"	আক্তার উদ্দিন	রেডিও ফিটার
৭৬।	৭১০৯৩	সার্জেন্ট	এম আব্দুল ওয়াহিদ	এমটিডি
৭৭।	৭৭০৯৯	ফ্লা: সা:	মোহাম্মদ জামাল	জিএস-১
৭৮।	৭১৩৮৪	ও:স:	সুলতান আহমেদ	প্রভোস্ট
৭৯।	৭১৪০৫	ফ্লা: সা:	এম মজিবুর রহমান	জিএস-১
৮০।	৭১৪৪০	ও:অ:এম	শের আলী	"
৮১।	৭১৪৫৫	"	আব্দুর রশিদ খান	এমটি ফিটার
৮২।	৭১৫০৮	মা:ও:অ	দায়েম উল্লাহ	জিএস-১
৮৩।	৭১৫২৪	ও:অ:	ওয়ালী উল্লাহ	সেক: অ্যাসি: (জিডি)
৮৪।	৭১৫৭৬	"	এম আব্দুল জলিল	"
৮৫।	৭১৬১১	মা:ও:অ:	নুরুল মোস্তফা চৌধুরী	জিএস-১
৮৬।	৭১৭১৪	ফ্লা:সা:	কাজী নুরুল হুদা	এম টিডি
৮৭।	৭১৭৩৪	ও:অ:এম:	আবুল হোসেন	সাপ্লাই অ্যাসি
৮৮।	৭১৭৪১	মা:ও: অ:	এম ওয়াজেদ আলী	এফসিও
৮৯।	৭১৭৫০	"	এম ছালেহ জহুর চৌধুরী	সাপ্লাই অ্যাসি
৯০।	৭১৭৫৪	ফ্লা: সা:	এম আব্দুল করিম	এমটিডি
৯১।	৭১৭৬৯	মা:ও:অ:	এম আব্দুল খালেক	সেক: অ্যাসি: (জিডি)
৯২।	৭১৭৭১	ফ্লা:সা:	এম শামসুল আলম	জিএস-১
৯৩।	৭১৭৭৫	মা:ও:অ:	মোফিজ উদ্দিন আহম্মেদ	এটিসি
৯৪।	৭১৮০৫	ও:অ:	আব্দুর রহমান	এমটিডি
৯৫।	৭১৮১৩	"	খায়েজ আহমেদ চৌধুরী	সাপ্লাই অ্যাসি
৯৬।	৭১৮১৫	মা:ও:অ:	আব্দুল আওয়াল	এয়ার ক্রাফট ফিটার
৯৭।	৭১৮৩১	ও:অ:	এম রুস্তম আলী	আর্ম: ফিটার
৯৮।	৭১৯০৮	সার্জেন্ট	আজিজুল হক	জিএস-১
৯৯।	৭১৯৮৩	ফ্লা:সা:	আব্দুল লতিফ মজুমদার	ফ্লাইট: ইঞ্জি:
১০০।	৭১৯৯৩	ও:অ:	এম শামছুল হক	প্রভোস্ট
১০১।	৭১৯৯৭	সার্জেন্ট	তালুকদার ছিদ্দিকুর রহমান	এমটিডি
১০২।	৭২০৭৪	মা:ও:অ:	এম শফিকুল হক	প্রভোস্ট
১০৩।	৭২০৭৪	ফ্লা:সা:	শামছুল হুদা তালুকদার	জিএস-১

১০৪।	৭২১৫৯	মা:ও:অ:	এম আতাউর রহমান	এয়ার ক্রাফট ফিটার
১০৫।	৭২২৬৫	ফ্লা:সা:	আনোয়ার হোসেন	প্রভোস্ট
১০৬।	৭২৩৩১	সার্জেন্ট	এস জি এম মহিউদ্দিন	সাপ্লাই অ্যাসি
১০৭।	৭২৩৭৬	ফ্লা:সা:	এম আলী আকবর	এফসিও
১০৮।	৭২৩৮৬	ও:অ:	এ কে মতিউর রব	জেনা: ইঞ্জি:
১০৯।	৭২৪৫৪	মা:ও:অ:	এম খলিলুর রহমান	আর্ম: ফিটার
১১০।	৭২৪৬২	"	এস সিরাজুল হক	এয়ার ক্রাফট ফিটার
১১১।	৭২৫১৯	"	মকবুল হোসেন সরদার	এফসিও
১১২।	৭২৫৩১	"	এম আককাস আলী	এলএসইডাব্লিও
১১৩।	৭২৫৪৪	ও:অ:	এম ই হক শরীফ	আর্ম: ফিটার
১১৪।	৭২৫৭৫	ফ্লা: সা:	ফয়েজ উল্লাহ	জিএস-১
১১৫।	৭২৬২২	মা:ও:অ:	আবুল কাসেম চৌধুরী	"
১১৬।	৭২৬৫২	ফ্লা:সা:	এম সানোয়ার আলী	"
১১৭।	৭২৬৭৩	"	এম ওয়ালীউল ইসলাম	রেডিও ফিটার
১১৮।	৭২৭২৭	"	সেখ দাউদ আহমেদ	মেডি: অ্যাসি
১১৯।	৭২৭৫৫	সার্জেন্ট	এম এ বাতেন	ক্লার্ক জিডি
১২০।	৭২৭৭৫	"	জামাল উদ্দিন	ইলেকট্রিক ফিটার
১২১।	৭২৭৯৩	ফ্লা: সা:	এম শফিকুল ইসলাম চৌধুরী	আর্ম ফিটার
১২২।	৭২৮১০	সার্জেন্ট	এম আবুল কাসেম	এয়ারফ্রেম ফিটার
১২৩।	৭২৮১৪	ফ্লা:সা:	এম ইসমাইল	ফ্লাইট ইঞ্জি:
১২৪।	৭২৮১৫	"	আবদুর রাজ্জাক	সাপ্লাই অ্যাসি:
১২৫।	৭২৮১৯	মা:ও:অ:	আমীর হোসেন চৌধুরী	"
১২৬।	৭২৮৪২	মা:অ:মোঃ	সৈয়দ মনিরুজ্জামান	সাইফার অ্যাসি
১২৭।	৭২৮৪৪	সার্জেন্ট	এম আব্দুল মোমেন	জিএস-১
১২৮।	৭২৮৪৬	ফ্লা:সা:	নুর মোহাম্মদ মিয়া	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
১২৯।	৭২৮৫৭	মা:ও:মোঃ	নুরুল ইসলাম	সেক: অ্যাসি: (জিডি)
১৩০।	৭২৮৫৮	ফ্লা:সা:	মোহাম্মদ আলী	সাপ্লাই অ্যাসি
১৩১।	৭২৮৫৯	সার্জেন্ট	সাদেক আহমেদ খান	ইনস্ট্রুমেন্ট ফিটার
১৩২।	৭২৮৮২	মা:ও:অ:	এম ফজলুল হক	লোড মাস্টার
১৩৩।	৭২৮৮৩	ফ্লা:সা:	এম আবু হান্নান	জিএস-১
১৩৪।	৭২৮৯৪	ও:অ:	ওয়ালী উল্লাহ	রেডিও ফিটার
১৩৫।	৭২৯০৬	মা:ও:অ:	আব্দুল কাদের	রেডিও ফিটার
১৩৬।	৭২৯১৯	সার্জেন্ট	এম নূরুল হুদা	ক্লার্ক জিডি
১৩৭।	৭২৯৩৯	ও:অ:	সেখ এম ইজামউদ্দিন	রেডিও ফিটার
১৩৮।	৭২৯৪১	সার্জেন্ট	এম আব্দুল জলিল	র‌্যাডার ফিটার
১৩৯।	৭২৯৫৯	কর্পোরাল	মির্জা আব্দুর রউফ	অয়্যারলেস ফিটার
১৪০।	৭২৯৬৫	ও:অ:	এম নূরুল আমিন	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৪১।	৭২৯৬৮	"	আফজালুর রহমান	রেডিও পিটার
১৪২।	৭২৯৮২	সার্জেন্ট	এম শাহ আলম	প্রভোস্ট
১৪৩।	৭২৯৯৩	ও:অ:	আব্দুল কাদের	জিসি
১৪৪।	৭৩০১৩	মা:ও:অ:	মফিজুর রহমান	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৪৫।	৭৩০১৬	"	বসির আহমেদ	লোড মাস্টার
১৪৬।	৭৩০৫৫	ও:অ:	এম লুৎফর রহমান	এমটিডি

১৪৭। ৭৩০৫৮	সার্জেন্ট	এম হাসমত উল্লাহ	ফ্লাইট ইঞ্জি:
১৪৮। ৭৩০৬৫	"	এম আইয়ুব আলী	এমটিডি
১৪৯। ৭৩০৭১	ও:অ:	মশিউর রহমান	ফ্লাইট ইঞ্জি:
১৫০। ৭৩১১৩	সার্জেন্ট	সিদ্দিক আহমেদ	এমটিডি
১৫১। ৭৩১২৫	ফ্লা:সা:	আব্দুল হাকিম	সেক: অ্যাসি: (জিডি)
১৫২। ৭৩১২৬	মা:ও:অ:	দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী	পিএফঅ্যান্ডডি আই
১৫৩। ৭৩১২৮	"	আব্দুল হক	ফ্লাইট ইঞ্জি:
১৫৪। ৭৩১৩২	সার্জেন্ট	মোঃ ইদ্রিস	প্রভোস্ট
১৫৫। ৭৩১৪৪	ফ্লা:সা:	এম আইয়ুব আলী	জিএস-১
১৫৬। ৭৩১৫২	সার্জেন্ট	আব্দুর রব মিজি	এলএসইডাব্লিও
১৫৭। ৭৩১৫৮	মা:ও:অ:	আব্দুস সাত্তার তালুকদার	এয়ার সিগ:
১৫৮। ৭৩১৭০	ফ্লা:সা:	কামাল উদ্দিন	রেডিও ফিটার
১৫৯। ৭৩১৭২	"	আবু বকর সিদ্দিক	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৬০। ৭৩১৭৪	সার্জেন্ট	মোঃ শরীফ আজম	ইলেকট্রিক ফিটার
১৬১। ৭৩১৭৮	ফ্লা:সা:	নুরুল হক	পিএফঅ্যান্ডডি আই
১৬২। ৭৩১৮৪	ও:অ:	খলিলুর রহমান মিয়া	রেডিও ফিটার
১৬৩। ৭৩১৮৯	ফ্লা:সা:	মুসলেম উদ্দিন আহমেদ	"
১৬৪। ৭৩১৯৫	সার্জেন্ট	হোসেন আহমেদ	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৬৫। ৭৩২১৬	"	আবুল হোসেন	ইলেকট্রিক ফিটার
১৬৬। ৭৩২১৯	"	মোকারম হোসেন	রাডার ফিটার
১৬৭। ৭৩২২১	ও:অ:	তোফায়েল আহমেদ	রেডিও ফিটার
১৬৮। ৭৩২২৫	সার্জেন্ট	এ রশিদ খান	রাডার ফিটার
১৬৯। ৭৩২৩৬	ফ্লা:সা:	এম আবুল খায়ের	প্রভোস্ট
১৭০। ৭৩২২৪	"	জালাল আহমেদ	"
১৭১। ৭৩২৫৭	মা:ও:অ:	বদিউল আলম	রেডিও ফিটার
১৭২। ৭৩২৬০	সার্জেন্ট	হাফিজ আহমেদ	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৭৩। ৭৩২৬২	ফ্লা:সা:	তাজুল ইসলাম চৌধুরী	সেক: অ্যাসি:
১৭৪। ৭৩২৯৭	"	এম এনামুর রহমান	"
১৭৫। ৭৩৩১২	"	মোঃ ইসমাইল	প্রভোস্ট
১৭৬। ৭৩৩২১	"	আলতাফ হোসেন	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৭৭। ৭৩৩৩৬	ও:অ:	বি কে রায় চৌধুরী	সেক: অ্যাসি: (এ)
১৭৮। ৭৩৩৫৪	সার্জেন্ট	আব্দুর রাজ্জাক	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৭৯। ৭৩৩৫৫	ফ্লা:সা:	শামছুদ্দিন আহমেদ	"
১৮০। ৭৩৩৫৬	"	আব্দুল বাতেন	"
১৮১। ৭৩৩৬১	ফ্লা:সা:	এনামুল হক	সেক: অ্যাসি: (এ)
১৮২। ৭৩৩৬৬	সার্জেন্ট	মঈনউদ্দিন ভুইয়া	অয়্যালেস ফিটার
১৮৩। ৭৩৩৭০	ও:অ:	এম লোকমান	রেডিও ফিটার
১৮৪। ৭৩৩৮১	"	শামছুল আলম	এয়ারক্রাফট ফিটার
১৮৫। ৭৩৩৮২	সার্জেন্ট	আব্দুল ওয়াহাব	অয়্যারলেস ফিটার
১৮৬। ৭৩৩৮৯	ফ্লা:সা:	মোঃ হাফিজ	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৮৭। ৭৩৩৯৮	ও:অ:	মোহাম্মদ উল্লাহ	রেডিও ফিটার
১৮৮। ৭৩৪০৩	ফ্লা:সা:	সিরাজুল ইসলাম	এডমিন: অ্যাসি
১৮৯। ৭৪০২১	মা:ও:অ:	আবু সাইদ	রেডিও ফিটার

১৯০। ৭৪০২৩	ফ্লা:সা:	শাহজাদা মিয়া	সাপ্লাই অ্যাসি:
১৯১। ৭৪০৩৫	"	শাহজাহান খান মজলিস	"
১৯২। ৭৪০৩৮	সার্জেন্ট	মজিবুর রহমান	ক্লার্ক অ্যাকাউন্টস
১৯৩। ৭৪০৪১	সার্জেন্ট	মোজাম্মেল হক	"
১৯৪। ৭৪০৫০	ফ্লা:সা:	আবুল খায়ের	রেডিও ফিটার
১৯৫। ৭৪০৫২	"	মোয়াজ্জেম হোসেন	"
১৯৬। ৭৪০৫৮	সার্জেন্ট	রুহুল আমিন	অয়্যারলেস ফিটার
১৯৭। ৭৪০৬২	ফ্লা:সা:	ওমেদ আলী	রেডিও ফিটার
১৯৮। ৭৪০৬৪	"	তোফায়েল আহমেদ	"
১৯৯। ৭৪০৬৭	সার্জেন্ট	আব্দুল হান্নান	অয়্যারলেস ফিটার
২০০। ৭৪০৭৭	"	সিরাজুল হক	"
২০১। ৭৪১১৬	"	বাদশা আলম	জিএস-১
২০২। ৭৪১৩৪	ফ্লা:সা:	আলতাফ হোসেন	প্রভোস্ট
২০৩। ৭৪১৬১	"	আরশাদ খান	জিএস-১
২০৪। ৭৪১৬৫	কর্পোরাল	জয়নুল আবেদিন	সাপ্লাই অ্যাসি:
২০৫। ৭৪১৬৬	"	আনোয়ারুল হক	অয়্যারলেস ফিটার
২০৬। ৭৪১৮৫	ফ্লা:সা:	বদিউজ্জামান খান	রেডিও ফিটার
২০৭। ৭৪১৯৮	সার্জেন্ট	এম শফিউল্লাহ	অয়্যারলেস ফিটার
২০৮। ৭৪২০১	ফ্লা:সা:	মির আমজাদ হোসেন	জিএস-১
২০৯। ৭৪২০২	"	শহীদুল হক	রেডিও ফিটার
২১০। ৭৪২০৪	সার্জেন্ট	আব্দুল মতিন মজুমদার	এফসিও
২১১। ৭৪২০৫	ও:অ:	মোহাম্মদ হানিফ	"
২১২। ৭৪২১২	ফ্লা:সা:	আব্দুল মতিন	"
২১৩। ৭৪২১৪	"	এম হাফিজুল ইসলাম	প্রভোস্ট
২১৪। ৭৪২২৬	সার্জেন্ট	এম আব্দুস শহীদ	এফসিও
২১৫। ৭৪২৪৯	এস এ সি	এম জালাল আহমেদ	রাডার মেক:
২১৬। ৭৪২৫০	ফ্লা:সা:	নজরুল ইসলাম	রেডিও ফিটার
২১৭। ৭৪২৫৪	ও:অ:	এম মজিবুল হক	প্রভোস্ট
২১৮। ৭৪২৫৯	"	এ বি এম হাতেম আলী	সাপ্লাই অ্যাসি:
২১৯। ৭৪২৬৬	মা:ও:অ:	এম ওহিদউল্লাহ	এমটি ফিটার
২২০। ৭৪২৬৮	সার্জেন্ট	এম খালেক উদ্দিন	অয়্যারলেস ফিটার
২২১। ৭৪২৭৭	ফ্লা:সা:	নূর মোহাম্মদ তরফদার	সাপ্লাই অ্যাসি:
২২২। ৭৪২৯৭	ও:অ:	মিলন কান্তি বড়ুয়া	এটিসি
২২৩। ৭৪৩০৭	ফ্লা:সা:	এম ইসকান্দার আলী হাওলাদার	লোড মাস্টার
২২৪। ৭৪৬১৮	ও:অ:	রফিকুল ইসলাম	ইড়ু: ই:
২২৫। ৭৪৬১৯	মা:ও:অ:	সিকদার আব্দুর নূর	"
২২৬। ৭৪৬৪৩	ও:অ:	হেকমত আলী ফকির	এমটি ডি
২২৭। ৭৪৬৪৪	ফ্লা:সা:	আলী আজম মিয়া	আর্ম: ফিটার
২২৮। ৭৪৬৪৫	সার্জেন্ট	সিদ্দিক আহমেদ খান	এফসিও
২২৯। ৭৪৬৭৯	"	এম এম সিরাজুল ইসলাম	মেডি: অ্যাসি:
২৩০। ৭৪৬৮১	ও:অ:	বসরত উল্লাহ	প্রভোস্ট
২৩১। ৭৪৬৯৮	"	আবুল কালাম হাওলাদার	এফসিও
২৩২। ৭৪৭০০	কর্পোরাল	মঈন উদ্দিন আহমেদ	জিএস-১

২৩৩। ৭৪৭১৫	ফ্লা:সা:	মোখলেছুর রহমান	আর্ম: ফিটার
২৩৪। ৭৪৭১৬	কর্পোরাল	মহসিন উদ্দিন	জিএস-১
২৩৫। ৭৪৭২২	সার্জেন্ট	শওকত ওসমান চৌধুরী	আর্ম: ফিটার
২৩৬। ৭৪৭২৪	ফ্লা:সা:	মোশারফ হোসেন	এফসিও
২৩৭। ৭৪৭৩৭	ও:অ:	এম লুৎফর রহমান	জিএস-১
২৩৮। ৭৪৭৪৫	ফ্লা:সা:	এম হাবিবুর রহমান	এফসিও
২৩৯। ৭৪৭৫৪	ও:অ:	মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন	জিএস-১
২৪০। ৭৪৮১১	মা:ও:অ:	আব্দুল হাফিজ খান	এয়ার গানার
২৪১। ৭৪৭৪৮	ফ্লা:সা:	আফতাব আহমেদ মিয়া	আর্ম: ফিটার
২৪২। ৭৪৮১৬	সার্জেন্ট	আব্বাস খান	এমটি ডি
২৪৩। ৭৪৮৩৯	ফ্লা:সা:	এবাদুল হক	আর্ম: ফিটার
২৪৪। ৭৪৮৪১	সার্জেন্ট	আব্দুল করিম মজুমদার	এফসিও
২৪৫। ৭৪৮৪৯	ও:অ:	সরদার আব্দুস সোবাহান	জিএস-১
২৪৬। ৭৪৮৫৭	ফ্লা:সা:	মোহাম্মদ আনসার উদ্দিন	আর্ম: ফিটার
২৪৭। ৭৪৮৭০	ও:অ:	এম রুহুল আমিন	মেড: অ্যাসি:
২৪৮। ৭৪৮৮৫	সার্জেন্ট	এস এম নূরুল হক	আর্ম: ফিটার
২৪৯। ৭৪৮৮৬	ফ্লা:সা:	এম গোলাম মাওলা	এফসিও
২৫০। ৭৫২৪৮	ও:অ:	জাবেদ আলী শেখ	এডু: ইন:
২৫১। ৭৫২৭২	মো:ও:অ:	এম ইয়াছিন খান	প্রভোস্ট
২৫২। ৭৫২৭৩	সার্জেন্ট	মোহাম্মদ রাজা মিয়া	মেড: অ্যাসি:
২৫৩। ৭৫২৮৭	সার্জেন্ট	এম করম আলী	আর্ম: ফিটার
২৫৪। ৭৫৩০৮	সার্জেন্ট	কে এম আব্দুল কাদের	লোড মাস্টার
২৫৫। ৭৫৩০৯	ফ্লা:সা:	এম এম আরশাদ আলী	জিএস-১
২৫৬। ৭৫৩১২	ও:অ:	এম মাহবুবুল হক খান	মেড: অ্যাসি:
২৫৭। ৭৫৩৩৫	মা:ও:অ:	এম শরিফ উদ্দীন	অ্যাডমিন অ্যাসিস:
২৫৮। ৭৫৩৩৭	ফ্লা:সা:	এম নজরুল ইসলাম	এফসিও
২৫৯। ৭৫৪০৩	ফ্লা:সা:	মমিনুল হক ভুইয়া	আর্ম: ফিটার
২৬০। ৭৫৪১১	সার্জেন্ট	এ কে এম মইন উদ্দীন	জিসি
২৬১। ৭৫৪১৫	সার্জেন্ট	নাজিবুল হক	আর্ম: ফিটার
২৬২। ৭৫৪১৮	ফ্লা:সা:	এম আব্দুল হামিদ	জিসি
২৬৩। ৭৫৪২২	সার্জেন্ট	হামিদুল হক	
২৬৪। ৭৫৪২৩	ফ্লা:সা:	আব্দুল খালেক	আর্ম: ফিটার
২৬৫। ৭৫৪২৪	ফ্লা:সা:	লোকমান বড়ুয়া	এয়ার সিগ
২৬৬। ৭৫৪২৮	সার্জেন্ট	আব্দুস ছাত্তার	জিসি
২৬৭। ৭৫৪৪৯	ফ্লা:সা:	এম আব্দুল করিম	আর্ম: ফিটার
২৬৮। ৭৫৪৫৬	ফ্লা:সা:	মোস্তাহিদুল রহমান	মেড: অ্যাসিস:
২৬৯। ৭৫৪৫৮	"	এম আব্দুস শহিদ	জিএস-১
২৭০। ৭৫৪৬৪	"	এস এম ইয়াকুব আলী	লোড মাস্টার
২৭১। ৭৬৪৬৪	ফ্লা:সা:	এম আব্দুল আউয়াল	এফসিও
২৭২। ৭৬৪৩৫	"	এম আব্দুর রহমান	আর্ম: ফিটার
২৭৩। ৭৬৪৩৮	"	লুৎফর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
২৭৪। ৭৬৪৩৯	"	এম আবুল কাসেম	এয়ার গানার
২৭৫। ৭৬৪৬০	মা:ও:অ:	এম সুন্নত আলী	এমটি ফিটার

২৭৬। ৭৬৪৬৮	ফ্লাঃসাঃ	আব্দুর রব ভুঁইয়া	আর্মঃ ফিটার
২৭৭। ৭৬৪৭২	সার্জেন্ট	এম সামছুল আলম	এমটি ফিটার
২৭৮। ৭৬৪৮৮	"	খান জয়নুল আবেদিন	জিসি
২৭৯। ৭৬৫০১	"	মহিউদ্দীন	জিসি
২৮০। ৭৬৫১১	"	আব্দুল খালেক	সাঃ অ্যাসিসঃ
২৮১। ৭৬৫২৩	ওঃঅঃ	এম নূর হোসেন	জিসি
২৮২। ৭৬৫৪৭	ফ্লাঃসাঃ	কাজী গিয়াসউদ্দিন	জিসি-১
২৮৩। ৭৬৫৬০	"	এম শহিদ উল্লাহ	জিসি
২৮৪। ৭৬৫৬৫	সার্জেন্ট	এম লুৎফর রহমান	আর্মঃ ফিটার
২৮৪। ৭৬৫৭০	ফ্লাঃসাঃ	আব্দুল মান্নান মিয়া	সাঃঅ্যাসিসঃ
২৮৬। ৭৬৫৭৫	সার্জেন্ট	এম আবুল কাসেম	এমটিডি
২৮৭। ৭৬৫৮০	ফ্লাঃসাঃ	আব্দুল কুদ্দুস খান	আর্মঃ ফিটার
২৮৮। ৭৬৫৮৩	"	এম জাফর আহমেদ	"
২৮৯। ৭৬৫৮৪	কর্পোরাল	মনির আহমেদ	"
২৯০। ৭৬৬০৩	ওঃঅঃ	এম আলী আকবর মিয়া	এয়ারক্রাফট ফিটার
২৯১। ৭৬৬২১	"	আব্দুল মোমেন	জিসি
২৯২। ৭৬৭২০	ফ্লাঃসাঃ	এম আব্দুল হালিম	জিসি-১
২৯৩। ৭৬৭২৫	"	এ বি এম রফিকুল ইসলাম	আর্মঃ ফিটার
২৯৪। ৭৬৭২৩	"	এম আবদুর রশিদ	জি এস-১
২৯৫। ৭৬৭৯২	সার্জেন্ট	এম আজিজুর রহমান	প্রভোস্ট
২৯৬। ৭৬৮৫২	"	মোঃ আফাজ উদ্দীন ভুঁইয়া	জিসি
২৯৭। ৭৬৮৭৬	ফ্লাঃসাঃ	আবদুস ছালাম ভুঁইয়া	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
২৯৮। ৭৬৯৩৩	মাঃওঃঅঃ	মোস্তফা মোমেন	এমটি ফিটার
২৯৯। ৭৬৯৫০	ওঃঅঃ	আবদুর গফুর	এমটি ফিটার
৩০০। ৭৬৯৫৫	মাঃওঃঅঃ	খন্দকার এনামুল কবির	পিএফঅ্যান্ডডিআই
৩০১। ৭৬৯৫৬	ফ্লাঃসাঃ	এম আবু তাহের পাটোয়ারী	এমটিডি
৩০২। ৭৬৯৫৯	মাঃওঃঅঃ	একরামুল হোসেন	সাইফার অ্যাসিসঃ
৩০৩। ৭৬৯৬৪	ওঃঅঃ	এম খলিলুর রহমান ভুঁইয়া	এমটি ফিটার
৩০৪। ৭৬৯৭২	মাঃওঃঅঃ	সৈয়দ রেজয়ান আলী	পিএফঅ্যান্ডডিআই
৩০৫। ৭৬৯৯৫	"	হোসেন আহমেদ	এয়ার সিগ
৩০৬। ৭৭০০৫	ফ্লাঃসাঃ	এম আজহার আলী	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৩০৭। ৭৭০২১	সার্জেন্ট	আবুল বাসার খান	জিসি
৩০৮। ৭৭০২৮	"	এম সাখাওয়াত হোসেন	ইলেঃ ফিটার
৩০৯। ৭৭০৩২	ওঃঅঃ	মোঃ হোসেন পাটোয়ারী	এমটিডি
৩১০। ৭৭০৪৫	সার্জেন্ট	তোফাজ্জল হোসেন	জিএস-১
৩১১। ৭৭৩১৭	ফ্লাঃসাঃ	এম রতন আলী শরীফ	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩১২। ৭৭৩১৮	"	সরদার রতন হোসেন	জিএস-১
৩১৩। ৭৭৩২৭	সার্জেন্ট	আবুল বাশার	প্রভোস্ট
৩১৪। ৭৭৩৪৫	সার্জেন্ট	এম মতিউর রহমান তালুকদার	ক্লার্ক অ্যাকাউন্টস
৩১৫। ৭৭৩৫৮	ওঃঅঃ	মোসলেম উদ্দীন	প্রভোস্ট
৩১৬। ৭৭৩৬১	সার্জেন্ট	আমির আলী	এমটিডি
৩১৭। ৭৭৩৬৯	ফ্লাঃসাঃ	মকবুল আহমেদ	জিএস-১
৩১৮। ৭৭৩৭৪	"	মতিউর রহমান	জিসি

৩১৯। ৭৭৩৮২	সার্জেন্ট	এম মমতাজুল হক	"
৩২০। ৭৭৪১০	ফ্লা:সা:	জালাল আহমেদ	জিএস-১
৩২১। ৭৭৪৩০	ও:অ:	আজিজুর রহমান	জিসি
৩২২। ৭৭৪৩৭	সার্জেন্ট	সৈয়দ রফিকুল ইসলাম	"
৩২৩। ৭৭৪৩৮	ফ্লা:সা:	আবু ইউছুপ এম মহিউদ্দীন	"
৩২৪। ৭৭৪৫৯	সার্জেন্ট	এম সাইদুর রহমান	"
৩২৫। ৭৭৪৬৬	ফ্লা:সা:	সৈয়দ আবদুল হালিম	"
৩২৬। ৭৭৪৭১	সার্জেন্ট	এম আবদুল কাদের	মেড: অ্যাসিস
৩২৭। ৭৭৪৭৭	ও:অ:	এম রহমত উল্লা	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩২৮। ৭৭৪৮২	সার্জেন্ট	এস এম খুরশিদ আলী	জিএস-১
৩২৯। ৭৭৪৯৪	ফ্লা:সা:	এ বি এম ফজলুর রহমান	"
৩৩০। ৭৭৪৯৫	"	আবদুস সামাদ সিকদার	জিসি
৩৩১। ৭৭৯৭২	ও:অ:	এম রফিকুল ইসলাম	ফ্লাইট ইন:
৩৩২। ৭৭৯৮২	মা:ও:অ:	সেখ আজাহার উদ্দীন	সাইফার অ্যাসিস
৩৩৩। ৭৭৯৮৬	ও:অ:	রেজাউল হক শরীফ	"
৩৩৪। ৭৭৯৮৯	ফ্লা:সা:	এ কে আনোয়ারুল হক	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৩৩৫। ৭৭৯৯৮	সার্জেন্ট	এম আবদুল আলীম	মেড:অ্যাসিস
৩৩৬। ৭৮০০১	কপল	এ এস এম আবদুর রব	ইঞ্জিন ফিটার
৩৩৭। ৭৮০১৫	ও:অ:	এম আবদুর রশিদ	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৩৩৮। ৭৮০১৭	ও:অ:	শাহ আলম	এটিসি
৩৩৯। ৭৮০২২	"	শাহাবুদ্দীন	অ্যাম্র ফিটার
৩৪০। ৭৮০৩৩	সার্জেন্ট	দেলোয়ার হোসেন	সা: অ্যাসিস
৩৪১। ৭৮০৩৮	ও:অ:	এম আমজাদ হোসেন	সেক: অ্যাসিস: (জিডি)
৩৪২। ৭৮০৫৮	ও:অ:	এম ফরিদ আক্তার	এমটিডি
৩৪৩। ৭৮০৬২	ফ্লা:সা:	নূর উদ্দীন আহম্মদ	অ্যাম্র ফিটার
৩৪৪। ৭৮০৬৩	"	নূরুন নবী	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৩৪৫। ৭৮০৬৬	ও:অ:	আবদুর রহমান	এমটি ফিটার
৩৪৬। ৭৮০৭৮	ফ্লা:সা:	আমিনুল হক	জিসি
৩৪৭। ৭৮০৮৯	সার্জেন্ট	মাহবুবুল আলম	এমটিডি
৩৪৮। ৭৮১০৫	কপল	শেখ আজিজুর রহমান	প্রভোস্ট
৩৪৯। ৭৮১১১	সার্জেন্ট	ফয়জুর রহমান খান	"
৩৫০। ৭৮১১২	"	এম শাহাদত হোসেন	ফ্লাইট ইঞ্জি:
৩৫১। ৭৮১১৬	ফ্লা:সা:	মুজিবুর রহমান	অয়্যারলেস ফিটার
৩৫২। ৭৮১২২	ও:অ:	এম জৈনদ্দিন	জেনারেল ইন:
৩৫৩। ৭৮১২৩	ফ্লা:সা:	এম আফতাব ইকবাল খান	রে:ফিটার
৩৫৪। ৭৮১২৬	ও:অ:	এম আইয়ুব আলী মোল্লা	এমটি ডি
৩৫৫। ৭৮১৩৫	মা:ও:অ:	আমানউল্লাহ	সেক: অ্যাসিস
৩৫৬। ৭৮১৪৮	কপল	এম আলী আশরাফ	অয়্যারলেস ফিটার
৩৫৭। ৭৮১৪৯	সার্জেন্ট	এম আঃ সালাম	সা: অ্যাসিস:
৩৫৮। ৭৮১৫৬	ফ্লা:সা:	এম নূরুল ইসলাম সরকার	জিএস-১
৩৫৯। ৭৮১৬১	সার্জেন্ট	এম আজিজুর রহমান	ইলেক: ফিটার
৩৬০। ৭৮৬১৬	ও:অ:	এম নূরুল হক	জেনারেল ইন:
৩৬১। ৭৮৬১৭	ফ্লা:সা:	এম আবদুস সাত্তার	জিএস-১

৩৬২। ৭৯১৫৬	কর্পোরাল	সাদেক আলী সরকার	জিএস-১
৩৬৩। ৭৯১৬২	ফ্লা:সা:	সরোয়ার আলম	রেডিও ফিটার
৩৬৪। ৭৯১৬৮	ও:অ:	হাফিজ আহমেদ	ফ্লাইট ইন:
৩৬৫। ৭৯১৭৫	সার্জেন্ট	আবুল কাসেম	অয়্যারলেস ফিটার
৩৬৬। ৭৯১৯৩	ও:অ:	মির্জা এইচ এম খালেক	ফ্লাইট ইন:
৩৬৭। ৭৯২১০	...	নূরুল ইসলাম	রেডিও ফিটার
৩৬৮। ৭৯২১১	ও:অ:	খলিলুর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩৬৯। ৭৯২১৭	ও:অ:	মফিজুর রহমান	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৩৭০। ৭৯২২৪	সার্জেন্ট	আবদুল কাদের	ইন ফিটার
৩৭১। ৭৯২৩৪	কর্পোরাল	রুহুল আমিন	সা: অ্যাসিস:
৩৭২। ৭৯২৪০	ফ্লা:সা:	রুহুল আমিন	জিসি
৩৭৩। ৭৯২৪৫	সার্জেন্ট	মোশারফ হোসেন	রাডার ফিটার
৩৭৪। ৭৯২১৮	ও:অ:	আবু জাহের	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩৭৫। ৭৯২৪৬	ফ্লা:সা:	ওলিউল্লাহ চৌধুরী	জিএস-১
৩৭৬। ৭৩২৯৭	ফ্লা:সা:	লাল মোঃ খান	সা: অ্যাসিস
৩৭৭। ৭৯৩০৭	কর্পোরাল	বখতিয়ার রহমান	রাডার ফিটার
৩৭৮। ৭৯৩০৯	সার্জেন্ট	এম নূরুল ইসলাম	ইন: ফিটার
৩৭৯। ৭৯৩১২	ফ্লা:সা:	জসিম উদ্দীন	রেডিও ফিটার
৩৮০। ৭৯৩১৪	সার্জেন্ট	এম সাহাবুদ্দিন	ক্লার্ক জিডি
৩৮১। ৭৯৩১৯	ও:অ:	আবদুল আজিজ খান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩৮২। ৭৯৩২৭	ফ্লা:সা:	শাহ সৈয়দ মোঃ হাসান	ফটো-১
৩৮৩। ৭৯৩২৯	স্যার্জেন্ট	আব্দুর রশিদ	সা: অ্যাসিস:
৩৮৪। ৭৯৩৪৪	সার্জেন্ট	আব্দুর রশিদ	"
৩৮৫। ৭৯৩৪৫	ও:অ:	মোসলেম উদ্দীন	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩৮৬। ৭৯৩৫০	ও:অ:	মোকলেছুর রহমান	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৩৮৭। ৭৯৩৫৩	"	গোলাম সরোয়ার	"
৩৮৮। ৭৯৩৫৭	সার্জেন্ট	আশরাফ উদ্দীন আহমেদ	ইন: ফিটার
৩৮৯। ৭৯৩৬৯	এসএসি	সামছুল আমিন	রাডার ফিটার
৩৯০। ৭৯৩৮৮	সার্জেন্ট	এম মইনউদ্দীন	এয়ারফ্রেম ফিট
৩৯১। ৭৯৪০০	"	জমশেদুর রহমান	ক্লার্ক জিডি
৩৯২। ৭৯৪০২	ফ্লা:সা:	সৈয়দ সাইফুল আলম	সা: অ্যাসিস:
৩৯৩। ৭৯৪২০	"	শেখ মুজিবর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৩৯৪। ৭৯৪২৩	কর্পোরাল	এম আব্দুল আজিজ মণ্ডল	আর্ম: ফিটার
৩৯৫। ৭৯৭৩০	সার্জেন্ট	এম গিয়াসউদ্দীন	জিএস-১
৩৯৬। ৭৯৭৪৬	ও:অ:	এম আবুল কালাম	সেক অ্যাসিস:
৩৯৭। ৭৯৭৪৭	সার্জেন্ট	হারুন আল রশিদ	ক্লার্ক জিডি
৩৯৮। ৭৯৭৬৮	ফ্লা:সা:	রবীন্দ্র নাথ তালুকদার	জিএস-১
৩৯৯। ৭৯৭৮৪	ও:অ:	এম খিজির আলী	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪০০। ৭৯৮২৭	"	এম আমিনুল ইসলাম	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৪০১। ৭৯৮৩৮	সার্জেন্ট	এম শাহজাহান	ক্লার্ক জিডি
৪০২। ৮০২১৫	ও:অ:	মোজাম্মেল হক	সেক অ্যাসিস: (এ)
৪০৩। ৮০২৩৬	ফ্লা:সা:	এম মমিনুল ইসলাম	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪০৪। ৮০২৪০	ও:অ:	এম শহিদুল্লাহ	"

৪০৫। ৮০২৪৩	স্যার্জেন্ট	কাজী নূরুল ইসলাম	ইলেক: ফিটার
৪০৬। ৮০২৫৫	ও:অ:	ফজলুর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪০৭। ৮০৪৯০	সার্জেন্ট	শামছুল রহমান	ফ্লাইট ইঞ্জি:
৪০৮। ৮০৬৩৩	সার্জেন্ট	এম আলী আকবর	ক্লার্ক জিডি
৪০৯। ৮০৬৪১	কর্পোরাল	আব্দুর মতিন	"
৪১০। ৮০৬৪৮	ফ্লা:সা:	মোখলেছুর রহমান	সেক: অ্যাসি:
৪১১। ৮০৬৫০	কর্পোরাল	এম আব্দুর রব	ক্লার্ক একাউন্টস
৪১২। ৮০৬৫৩	ফ্লা:সা:	আবুল কাসেম	সেক: অ্যাসি: (এ)
৪১৩। ৮০৬৫৬	ফ্লা:সা:	আব্দুর রব	সেক: অ্যাসি:
৪১৪। ৮০৬৯৩	"	এম আবুল কাসেম	জিএস-১
৪১৫। ৮০৬৯৮	সার্জেন্ট	এ কে এম আশরাফ উদ্দিন	ইঞ্জি: ফিটার
৪১৬। ৮০৭০৬	"	এম নূরুল হক	ইলেকট্রিক ফিটার
৪১৭। ৮০৭১১	"	এম মজিবুর রহমান	জিএস-১
৪১৮। ৮১০৭২	ও:অ:	রশিদ আহমেদ	সেক: অ্যাসি
৪১৯। ৮১০৯০	সার্জেন্ট	এম জালাল উদ্দিন আহমেদ	সাপ্লাই অ্যাসি
৪২০। ৮১০৯৫	"	এম মতিউর রহমান	আর্ম: ফিটার
৪২১। ৮১১৬০	ও:অ:	এম আব্দুল জলিল	এমটি ফিটার
৪২২। ৮১১৬৫	ফ্লা:সা:	গোলাম মোস্তফা	রেডিও ফিটার
৪২৩। ৮১১৬৯	এলএসি	এম নূরুজ্জামান	রাডার
৪২৪। ৮১১৭৭	সার্জেন্ট	এম নূরুল হক	এলএসইডাব্লিও
৪২৫। ৮১৬২৮	কর্পোরাল	এম আবুল বাশার	অয়্যারলেস ফিটার
৪২৬। ৮১৬৪৪	ফ্লা:সা:	ফিরোজ খান নুন	রেডিও ফিটার
৪২৭। ৮১৬৪৭	"	এম সাদেক হোসেন	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪২৮। ৮১৬৯৮	"	এম শাহজাহান মিয়া	ফটো-১
৪২৯। ৮১৭০১	"	এম বোরহান উল্লাহ	এমটি ফিটার
৪৩০। ৮১৭৫৬	জে টি	এম মফিজ উদ্দিন আহমেদ	অয়্যারলেস ফিটার
৪৩১। ৮১৭৬৯	সার্জেন্ট	এম আক্তার হোসেন	ইঞ্জিন ফিটার
৪৩২। ৮১৭৭৮	কর্পোরাল	এ বি আহমদ হোসেন	"
৪৩৩। ৮১৭৮২	ফ্লা:সা:	এম সিরাজুল কবির	এমটি ফিটার
৪৩৪। ৭১৭৮৩	"	এম আজমত আলী মিয়া	ইঞ্জিন ফিটার
৪৩৫। ৮১৭৮৬	ও:অ:	এম মোখলেছুর রহমান	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৪৩৬। ৮১৭৮৮	ফ্লা:সা:	এম এম ফারুক	এয়াক্রাফট ফিটার
৪৩৭। ৮১৭৯০	ও:অ:	শামছুর কবির	ইএন্ডআই ফিটার
৪৩৮। ৮১৭৯৩	ফ্লা:সা:	আন্তাজ উদ্দিন	রেডিও ফিটার
৪৩৯। ৮১৮১৫	ও:অ:	এম খুরশিদ আলম খান	জেনা: ইঞ্জি:
৪৪০। ৮২০৭৯	কর্পোরাল	এম আকবর হোসেন	এমটি ফিটার
৪৪১। ৮২০৮৫	ফ্লা:সা:	নূর মোহাম্মদ খান	ইএন্ডআই ফিটার
৪৪২। ৮২০৮৮	"	কাজী এম মফিজুল ইসলাম	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪৪৩। ৮২১০৩	"	এম রেজাউর রহমান	"
৪৪৪। ৮২১১০	কর্পোরাল	মোখলেছুর রহমান	আর্ম: ফিটার
৪৪৫। ৮২১৯৩	ফ্লা:সা:	আব্দুস সালাম	"
৪৪৬। ৮২২০১	কর্পোরাল	এম শফিউল্লাহ	ইনস্ট্রু: ফিটার
৪৪৭। ৮২২০৯	ফ্লা:সা:	এম জাফর আলী	রেডিও ফিটার

৪৪৮। ৮২২২০	"	মনসুর আহমেদ মজুমদার	আর্মঃ ফিটার
৪৪৯। ৮২২৬৪	ও:অ:	এম ইসমাইল	ইএন্ডআই ফিটার
৪৫০। ৮২২৬৬	এলএসি	এম আব্দুল আজিজ	এমটিএম
৪৫১। ৮২২৭২	ফ্লা:সা:	আব্দুল মালেক	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪৫২। ৮২২৮৫	ফ্লা:সা:	এম আব্বাস খান	এয়ার গানার
৪৫৩। ৮২২৮৮	সার্জেন্ট	মোগল খান	আর্মঃ ফিটার
৪৫৪। ৮২২৯৬	"	এম শাহজাহান খান	এয়ারফ্রেম ফিটার
৪৫৫। ৮২৩৪৯	ও:অ:	এম নুরুল হক	মেটঃ অ্যাসিঃ
৪৫৬। ৮২৪৩৪	ফ্লা:সা:	এম তাজুল ইসলাম	সাপ্লাই অ্যাসিঃ
৪৫৭। ৮২৫৭২	"	এম আব্দুর রউফ	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪৫৮। ৮২৫৭৫	সার্জেন্ট	এম আবু আহমেদ	এমটি ফিটার
৪৫৯। ৮২৫৭৬	ফ্লা:সা:	এম সিদ্দিকুর রহমান	আর্মঃ ফিটার
৪৬০। ৮২৫৯২	কর্পোরাল	দেলোয়ার হোসেন	এয়ারফ্রেম ফিটার
৪৬১। ৮২৫৯৭	ফ্লা:সা:	আব্দুর রশিদ	আর্মঃ ফিটার
৪৬২। ৮২৬০৩	সার্জেন্ট	সুলতান আহমেদ খান	ইঞ্জিঃ ফিটার
৪৬৩। ৮২৬৯১	ফ্লা:সা:	বদিউজ্জামান	ইএন্ডআই ফিটার
৪৬৪। ৮২৬৯৪	কর্পোরাল	এম পিয়ার আহমেদ	আর্মঃ ফিটার
৪৬৫। ৮২৬৯৭	ফ্লা:সা:	জর্জ পালমা	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪৬৬। ৮২৭০৬	"	এম রজব আলী	এমটি ফিটার
৪৬৭। ৮২৭০৯	কর্পোরাল	এম আবু তাহের	ইনস্ট্রঃ ফিটার
৪৬৮। ৮২৭১৩	সার্জেন্ট	এম মকবুল হোসেন	"
৪৬৯। ৮২৭১৭	কর্পোরাল	এম আব্দুল জলিল	আর্মঃ ফিটার
৪৭০। ৮২৭১৯	"	এম শাহজাহান কবির	"
৪৭১। ৮২৭২৪	এলএসি	শামছুর রহমান	ফটো-২
৪৭২। ৮২৭৩৫	ফ্লা:সা:	মমিনুল হক ভুঁইয়া	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৪৭৩। ৮২৭৭৮	কর্পোরাল	এম নজরুল ইসলাম	এমটি ফিটার
৪৭৪। ৮২৭৮১	ফ্লা:সা:	এস এম ওয়ালীউর রহমান	"
৪৭৫। ৮২৮০৫	"	আবুল হোসেন সিদ্দিক	আর্মঃ ফিটার
৪৭৬। ৮২৮০৯	"	আব্দুর রশিদ	আর্মঃ ফিটার
৪৭৭। ৮২৮৪৭	সার্জেন্ট	ফজলুর রহমান	সাপ্লাই অ্যাসিঃ
৪৭৮। ৮২৮৪৮	ফ্লা:সা:	এম রহমতউল্লাহ	মেডিঃ অ্যাসিঃ
৪৭৯। ৮২৯৩৩	"	হারুন-উর-রশীদ	সাপ্লাই অ্যাসিঃ
৪৮০। ৮২৯৪১	"	আকরামুজ্জামান মুন্সি	"
৪৮১। ৮৩১২৮	কর্পোরাল	এম শফিকুর রহমান	এসিএফ
৪৮২। ৮৩১৩২	ফ্লা:সা:	এ কে এম শামছুল হুদা	আর্মঃ ফিটার
৪৮৩। ৮৩১৩৫	"	এম আব্দুর রাজ্জাক	"
৪৮৪। ৮৩১৩৬	"	এম শামছুর আলম	এয়ারক্রাফট ফিটার
৪৮৫। ৮৩১৩৭	ফ্লা:সা:	রকিব উদ্দিন আহমেদ	আর্মঃ ফিটার
৪৮৬। ৮৩১৬১	কর্পোরাল	হাফিজ আহমেদ মজুমদার	এয়ারফ্রেম ফিটার
৪৮৭। ৮৩১৬৩	সার্জেন্ট	আব্দুল মালেক খন্দকার	আর্মঃ ফিটার
৪৮৮। ৮৩১৬৯	ফ্লা:সা:	এম আব্দুর রশিদ	"
৪৮৯। ৮৩১৮৬	"	এম আব্দুর রশিদ	"
৪৯০। ৮৩১৮৯	কর্পোরাল	রুস্তম আলী	"

৪৯১। ৮৩১৯৮	সার্জেন্ট	ওবায়েদুল হক	ইঞ্জি: ফিটার
৪৯২। ৮৩২০২	ফ্লা:সা:	এম আব্দুল হান্নান	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৪৯৩। ৮৩২০৩	সার্জেন্ট	এম সিরাজুল হক	ফটো-১
৪৯৪। ৮৩২০৮	"	এম হামিদুল হক	আর্ম: ফিটার
৪৯৫। ৮৩২২২	"	ওয়াহিদুউজ্জামান	ইলেকট্রি: ফিটার
৪৯৬। ৮৩২৩১	ফ্লা:সা:	এম রুহুল আমিন	আর্ম: ফিটার
৪৯৭। ৮৩২৩২	কর্পোরাল	এম আব্দুর রব	"
৪৯৮। ৮৩২৩৮	সার্জেন্ট	এম মোজাম্মেল হক	"
৪৯৯। ৮৩২৪৭	কর্পোরাল	জামালউদ্দিন আহমেদ	এয়ারফ্রেম: ফিটার
৫০০। ৮৩২৫৫	এলএসি	এম সেলিম	আর্ম: ফিটার
৫০১। ৮৩২৫৮	সার্জেন্ট	এম তাজুল ইসলাম	এসিএফ
৫০২। ৮৩২৬৬	ফ্লা:সা:	আবু বাসেত সরকার	এয়ারক্রাফট ফিটার
৫০৩। ৮৩২৬৮	"	এম রেজাউর রহমান	"
৫০৪। ৮৩২৭০	সার্জেন্ট	এম সাজেদুল করিম	এয়ারফ্রেম ফিটার
৫০৫। ৮৩২৭৯	কর্পোরাল	হাবিবুর রহমান	আর্ম: ফিটার
৫০৬। ৮৩২৯৫	এলএসি	জালাল আহমেদ	মেট: অ্যাসি:
৫০৭। ৮৩৩০৫	ফ্লা:সা:	এডমন কারডোজা	মেডি: অ্যাসি:
৫০৮। ৮৩৩৪৭	কর্পোরাল	এম ওলিউর রহমান	"
৫০৯। ৮৩৩৫০	ফ্লা:সা:	এম হুমায়ুন কবির	সেক: অ্যাসি:
৫১০। ৮৩৩৮৩	"	আব্দুল হালিম মোল্লা	ক্যাট: অ্যাসি:
৫১১। ৮৩৩৯৬	সার্জেন্ট	এম মজিবুল হক	সাপ্লাই অ্যাসি:
৫১২। ৮৩৩৯৭	সার্জেন্ট	মোশারফ হোসেন	সাপ্লাই অ্যাসি:
৫১৩। ৮৩৪২২	ও:অ:	এম শফি উল্লাহ	এডু:ই:
৫১৪। ৮৪৪২৪	মা:ও:অ:	এ কে সুলতান আহমেদ	"
৫১৫। ৮৩৪৩৯	ফ্লা:সা:	আহমেদ আলী	জেনা: ইঞ্জি:
৫১৬। ৮৩৪৪২	সার্জেন্ট	মোজাম্মেল হক	ইলেকট্রি: ফিটার
৫১৭। ৮৩৪৪৫	কর্পোরাল	আব্দুল মজিদ	ইনস্ট্রু: ফিটার
৫১৮। ৮৩৪৪৭	"	আলতাফ হোসেন	ফটো-১
৫১৯। ৮৩৪৫৩	ফ্লা:সা:	এম আবুল খায়ের	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৫২০। ৮৩৪৫৪	কর্পোরাল	আব্দুল খালেক	অয়্যারলেস ফিটার
৫২১। ৮৩৪৬৫	ফ্লা:সা:	মোঃ হানিফ	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৫২২। ৮৩৪৬৬	"	এম ওয়ালী উর রহমান	এয়াক্রাফট ফিটার
৫২৩। ৮৩৪৬৮	"	এম সিরাজুল ইসলাম	"
৫২৪। ৮৩৪৭৮	ফ্লা:সা:	এম শাহজাহান	ফটো-১
৫২৫। ৮৩৪৮১	"	এম আনিসুর রহমান	এলএসইডাব্লিউ
৫২৬। ৮৩৪৯৫	এলএসি	জাহাঙ্গীর আলম	আর্ম:মেক:
৫২৭। ৮৩৫৪৯	এসি-১	এম রুহুল আমিন	"
৫২৮। ৮৩৫৫২	ফ্লা:সা:	এ বি এম শাহজাহান মোল্লা	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৫২৯। ৮৩৫৫৫	সার্জেন্ট	শরাফউদ্দিন আহমেদ	ইনস্ট্রু:ফিটার
৫৩০। ৮৩৫৬৪	কর্পোরাল	এম হামিদ	ইনস্ট্রু:ফিটার
৫৩১। ৮৩৫৬৮	সার্জেন্ট	শাহ এম আব্দুল্লা আল বাকী	আর্ম: ফিটার
৫৩২। ৮৩৬৪০	ও:অ:	আককাস আলী ভূঁইয়া	লোড মাস্টার
৫৩৩। ৮৩৬৫০	ফ্লা:সা:	কাজী আনিসুজ্জামান	সাপ্লাই অ্যাসি:

৫৩৪। ৮৩৬৮০	সার্জেন্ট	এম লিয়াকত উল্লাহ	ক্যাট অ্যাসি:
৫৩৫। ৮৩৬৮৮	ফ্লা:সা:	আব্দুল জলিল	সেক: অ্যাসি:
৫৩৬। ৮৩৬৮৯	সার্জেন্ট	এম নূরুল ইসলাম	প্রভোস্ট
৫৩৭। ৮৩৬৯০	কর্পোরাল	আব্দুস সোবহান	"
৫৩৮। ৮৩৬৯৩	ফ্লা:সা:	আব্দুস ছাত্তার	এডমিন: অ্যাসি:
৫৩৯। ৮৩৬৯৮	এসি-১	এম খলিলুর রহমান	মেডি: অ্যাসি
৫৪০। ৮৩৮৪০	সার্জেন্ট	এম আলাউদ্দিন খান	ফটো-১
৫৪১। ৮৩৮৪৪	জেটি	এম মজিবুর রহমান	এয়ারফ্রেম ফিটার
৫৪২। ৮৩৮৫১	ফ্লা:সা:	আব্দুর রব	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৫৪৩। ৮৩৮৫৭	কর্পোরাল	এম হাফিজুর রহমান	আর্ম: ফিটার
৫৪৪। ৮৩৮৬৮	সার্জেন্ট	আইনুল কবির চৌধুরী	"
৫৪৫। ৮৩৮৭১	কর্পোরাল	এম আবুল কালাম	"
৫৪৬। ৮৩৮৭৯	ফ্লা:সা:	খন্দকার আব্দুর রাজ্জাক	রেডিও ফিটার
৫৪৭। ৮৩৮৯৮	কর্পোরাল	রবিউল আলম	এয়ারফ্রেম ফিটার
৫৪৭। ৮৩৮৯৯	"	মোঃ ইসহাক	এমডাব্লিউ
৫৪৯। ৮৩৯০২	"	এম নাসির উদ্দিন	আর্ম: ফিটার
৫৫০। ৮৩৯০৬	ফ্লা:সা:	এম নাসির উদ্দিন	এয়ারক্রাফট ফিটার
৫৫১। ৮৩৯০৭	কর্পোরাল	এম হাফিজুর রহমান	এমডাব্লিউ
৫৫২। ৮৩৯১১	"	সৈয়দ শফিউর রহমান	ইলেকট্রি: ফিটার
৫৫৩। ৮৩৯১৯	ফ্লা:সা:	আলী হায়দার	রেডিও ফিটার
৫৫৪। ৮৩৯২২	"	এম রফিক আহমেদ পাটুয়ারী	ইলেকট্রি: ফিটার
৫৫৫। ৮৩৯৩১	"	এম আলতাফ হোসেন	জেনা: ইঞ্জি:
৫৫৬। ৮৩৯৩৪	কর্পোরাল	এম আব্দুল গফুর	এয়ারফ্রেম ফিটার
৫৫৭। ৮৩৯৪৪	"	সৈয়দ হুমায়ুন কবির	ক্লার্ক জিডি
৫৫৮। ৮৩৯৯১	ফ্লা:সা:	এম আব্দুল আউয়াল	সেক: অ্যাসি
৫৫৯। ৮৩৯৯৩	এলএসি	এম রওশন আলী	স্টোর ম্যান জেনা:
৫৬০। ৮৩৯৯৮	ফ্লা:সা:	এম সাইদুর রহমান	সেক: অ্যাসি
৫৬১। ৮৪০০৬	সার্জেন্ট	এম শহীদউল্লাহ	সাপ্লাই অ্যাসি
৫৬২। ৮৪০১০	"	আব্দুর রশিদ	"
৫৬৩। ৮৪০১১	"	এম আব্দুল হামিদ	সেক: অ্যাসি
৫৬৪। ৮৪০১২	কর্পোরাল	আকবর হোসেন	ক্লার্ক জিডি
৫৬৫। ৮৪০২৮	সার্জেন্ট	খন্দকার রফিকুল ইসলাম	সাপ্লাই অ্যাসি
৫৬৬। ৮৪০৩১	ফ্লা:সা:	আব্দুল মোতালেব	প্রভোস্ট
৫৬৭। ৮৪১৫০	"	মোঃ আবু ছাফা	এয়ারক্রাফট ফিটার
৫৬৮। ৮৪১৬১	"	এম রবিউল আউয়াল	"
৫৬৯। ৮৪১৬৮	সার্জেন্ট	ফিরোজ খান	আর্ম: ফিটার
৫৭০। ৮৪১৮৮	ফ্লা:সা:	চৌধুরী সাহাব উদ্দিন	এয়ারক্রাফট ফিটার
৫৭১। ৮৪১৯৯	"	মির আবুল কালাম	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৫৭২। ৮৪২১৪	এলএসি	এম আমিনুল ইসলাম	ইঞ্জি: মেক:
৫৭৩। ৮৪৩০৮	সার্জেন্ট	নূরুল ইসলাম	ক্লার্ক জিডি
৫৭৪। ৮৪৩১০	কর্পোরাল	এম শামছুল হুদা	জিসি
৫৭৫। ৮৪৩২৪	এলএসি	আমজাদ হোসেন	আর্ম: মেক:
৫৭৬। ৮৪৩৩১	সার্জেন্ট	জালাল আহমেদ	এডমিন: অ্যাসি:

৫৭৭। ৮৪৩৯৪	"	এম জালাল উদ্দিন আহমেদ	ইলেকট্রি: ফিটার
৫৭৮। ৮৪৪৫৪	"	রেজাউল করিম	জিএস-১
৫৭৯। ৮৪৫১৪	কর্পোরাল	মুজিবুর রহমান	অয়্যারলেস ফিটার
৫৮০। ৮৪৫৯৩	ফ্লা:সা:	এম আবুল বাশার	প্রভোস্ট
৫৮১। ৮৪৬২৭	সার্জেন্ট	নুরুন নবী	জিসি
৫৮২। ৮৪৬৩৩	এলএসি	এন নবী	"
৫৮৩। ৮৪৭০৮	ফ্লা:সা:	এম আলতাফ হোসেন	এয়ারক্রাফট ফিটার
৫৮৪। ৮৪৭২৩	সার্জেন্ট	আওরংজেব খান	জিএস-১
৫৮৫। ৮৪৯৫৮	"	এ এন এম আতিকুর রহমান	এয়ারফ্রেম ফিটার
৫৮৬। ৮৬০৩৮	ও:অ:	এ রব	এমটি ফিটার
৫৮৭। ৮৬০৪৪	মা:ও:অ:	এম জমির উদ্দিন	ফ্লাইট ইঞ্জি:
৫৮৮। ৮৬০৪৬	"	এম আবুল হোসেন সরকার	এয়ারক্রাফট ফিটার
৫৮৯। ৮৬১৫৭	ও:অ:	মোহাম্মদ হোসেন	আর্ম: ফিটার
৫৯০। ৮৬১৫৮	"	সেখ মেসবাহ উদ্দিন আহমদ	ইঅ্যান্ডআই ফিটার
৫৯১। ৮৬৪৮৯	সার্জেন্ট	এম হাবিবুর রহমান	রাডার ফিটার
৫৯২। ৮৬৪৯০	ফ্লা:সা:	আব্দুস ছালাম সরকার	রেডিও ফিটার
৫৯৩। ৮৬৪৯৯	ফ্লা:সা:	আবুল কালাম	"
৫৯৪। ৮৬৫১০	ও:অ:	আব্দুস ছাত্তার খান	"
৫৯৫। ৮৬৫১৮	সার্জেন্ট	আফতাব উদ্দিন	রাডার ফিটার
৫৯৬। ৮৬৫৩২	ফ্লা:সা:	ইসমাইল ভূঁইয়া	রেডিও ফিটার
৫৯৭। ৮৬৫৩৬	"	মিজানুর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৫৯৮। ৮৬৫৩৯	ও:অ:	এম আলী কাদের জোয়ারদার	রেডিও ফিটার
৫৯৯। ৮৬৫৪৮	ফ্লা:সা:	ইউসুফ চৌধুরী	"
৬০০। ৮৬৬২৯	কর্পোরাল	আবুল বাশার	এয়ারফ্রেম ফিটার
৬০১। ৮৬৬৩১	মা:ও:অ:	শহীদুল হক খান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৬০২। ৮৬৬৪১	কর্পোরাল	মিজানুর রহমান	ইঞ্জি: ফিটার
৬০৩। ৮৬৬৪৭	ও:অ:	হারুন উর রশিদ	রেডিও ফিটার
৬০৪। ৮৬৬৪৯	"	দেলোয়ার হোসেন	এয়ারক্রাফট ফিটার
৬০৫। ৮৬৬৫৪	মা:ও:অ:	আবু তাহের মজুমদার	"
৬০৬। ৮৬৬৭৬	কর্পোরাল	আনোয়ার হোসেন	ইঞ্জি: ফিটার
৬০৭। ৮৬৬৭৮	ফ্লা:সা:	এম হযরত আলী মিয়া	রেডিও ফিটার
৬০৮। ৮৬৬৭৯	"	এম এ মতিন শাহ	"
৬০৯। ৮৬৬৮৩	ও:অ:	আব্দুল আশেক	এয়ারক্রাফট ফিটার
৬১০। ৮৬৬৮১	ফ্লা:সা:	এম শাহ জালাল	রেডিও ফিটার
৬১১। ৮৬৭৪১	"	এম আব্দুল হামিদ মিয়া	এয়ারক্রাফট ফিটার
৬১২। ৮৬৭৫১	"	এম সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারি	"
৬১৩। ৮৬৭৫২	কর্পোরাল	মোঃ আলী মিয়া	ইঞ্জি: ফিটার
৬১৪। ৮৫৭৫৩	এলএসি	এম মতিউর রহমান	ইঞ্জি: মেক:
৬১৫। ৮৬৭৯৮	ফ্লা:সা:	গোলাম মোস্তফা	ফটো-১
৬১৬। ৮৬৮২৩	কর্পোরাল	হামিদুল হক	রাডার ফিটার
৬১৭। ৮৬৮৩৫	সার্জেন্ট	এম এ গনী	অয়্যারলেস ফিটার
৬১৮। ৮৬৯২২	ফ্লা:সা:	এম মজিবুর রহমান	এয়ারক্রাফট ফিটার
৬১৯। ৮৬৯৪৪	কর্পোরাল	এম মাসুদ রব্বানী	ইঞ্জি: ফিটার

৬২০। ৮৬৯৫০	কর্পোরাল	এম গাজীউর রহমান	ইঞ্জি: ফিটার
৬২১। ৪৪০০২৫	ফ্লা:সা:	এম শফিক উল্লাহ	এয়ারক্রাফট ফিটার
৬২২। ৪৪০০৯৬	"	এম আব্দুর রহমান	"
৬২৩। ৪৪০২৫১	মা:ও:অ:	এম আব্দুর রউফ	এডু: ই:
৬২৪। ৪৪০৫৫৮	কর্পোরাল	এম এ বাশার মজুমদার	সাপ্লাই অ্যাসি:
৬২৫। ৪৪০৬৫১	"	এম মোশারফ হোসেন	ইনস্ট্রু ফিটার
৬২৬। ৪৪০৬৬১	এসি-১	এ বি এম রবিউল হক	ইঞ্জি: মেক:
৬২৭। ৪৪০৭০৯	কর্পোরাল	আলতাফ হোসেন	ফটো-১
৬২৮। ৪৪০৭৩৬	ফ্লা:সা:	এম লিয়াকত আলী	এয়ারফ্রেম ফিটার
৬২৯। ৪৪০৮৭১	"	এম আমিনুল ইসলাম	রেডিও ফিটার
৬৩০। ৭২৬১৫	কর্পোরাল	এম এ বারী	এমডাব্লিও (শহীদ)
৬৩১। ৭৯১৮০	জেটি	আবু হানিফ	রাডার ফিটার (শহীদ)
৬৩২। ৭৯৩৮৫	জেটি	এম রুহুল ইসলাম	এয়ারফ্রেম ফিটার (শহীদ)
৬৩৩। ৭৯৪০৮	"	সালে আহমেদ	ইলেকট্রি: ফিটার (শহীদ)
৬৩৪। ৮২২৭৪	এসি	ওমর ফারুক	এমটিএম (শহীদ)
৬৩৫। ৮০৬৯৯	এলএসি	আব্দুর সবুর	এলএসইডাব্লিও (শহীদ)
৬৩৬। ৮৩১৪০	"	রইস উদ্দিন আহম্মেদ	ইঞ্জি: মেক: (শহীদ)
৬৩৭। ৮৩২৯১	"	আব্দুল জলিল	মেট: অব: (শহীদ)
৬৩৮। ৮৩৪৬১	এসি	জাহাঙ্গীর হোসেন	রাডার মেক: (শহীদ)
৬৩৯। ৮৬২৭৩	সার্জেন্ট	আউয়াল হোসেন মোহাম্মদ	ইঞ্জি: ফিটার (শহীদ)
৬৪০। ৫২৯৭৮	"	শামছুল করিম খান	জিএস-১ (শহীদ)
৬৪১। ৫৩২০৫	"	আব্দুর রউফ	" (শহীদ)
৬৪২। ৫৪০৯৯	চিফ টেক:	এম মতিউর রহমান	সাপ্লাই অ্যাসি: (শহীদ)
৬৪৩। ৫৭৬৩০	ফ্লা:সা:	ও ওয়াহেদ তালুকদার	জিএস-১ (শহীদ)
৬৪৪। ৭০৬১৮	সার্জেন্ট	রফিকুল আলম চৌধুরী	" (শহীদ)
৬৪৫। ৫২৬৫৬	ফ্লা:সা:	আব্দুর রহিম ভুয়া	" (শহীদ)
৬৪৬। ৭০১৫০	সার্জেন্ট	হেদায়েত উল্লাহ	" (শহীদ)
৬৪৭। ৭১৭৬২	কর্পোরাল	আব্দুর রব	প্রভোস্ট (শহীদ)
৬৪৮। ৭২২৫৯	সার্জেন্ট	আকবর হোসেন	ক্লার্ক জিডি (শহীদ)
৬৪৯। ৭২৬২৬	"	মমতাজ উদ্দিন	জিএস-১ (শহীদ)
৬৫০। ৭২৭১৮	কর্পোরাল	নূর মোহাম্মদ	এফসিও (শহীদ)
৬৫১। ৭৩৩০২	সার্জেন্ট	আবু বকর সিদ্দিক	জিসি (শহীদ)
৬৫২। ৭৩২০১	কর্পোরাল	এম এ মতিন	অয়ারলেস ফিটার (শহীদ)
৬৫৩। ৭৩২১০	"	আমিনুল হক	রাডার ফিটার (শহীদ)
৬৫৪। ৭৪১২০	এসএসি	মীর শামছুউদ্দিন আহমেদ	সাপ্লাই অ্যাসি: (শহীদ)
৬৫৫। ৭৪৬৯৬	"	এম নূরুল হক	রাডার মেক: (শহীদ)
৬৫৬। ৭৪৭০৬	জেটি	আব্দুস সামাদ	এফসিও (শহীদ)
৬৫৭। ৭৫২৮১	কর্পোরাল	এম এ মান্নান	এমটিডি (শহীদ)
৬৫৮। ৭৬৪৩০	জেটি	মঞ্জুর হোসেন	আর্ম: ফিটার (শহীদ)
৬৫৯। ৭৬৪৬২	এলএসি	এম এ ছালাম	আর্ম: ফিটার (শহীদ)
৬৬০। ৭৬৯০৬	জেটি	শাহ আলম	জিএস-১ (শহীদ)
৬৬১। ৭৬৮৭৪	কর্পোরাল	এম শাহ আলম	" (শহীদ)
৬৬২। ৭৬৭৪২	জেটি	মুজ্জাফর হোসেন	এমটি ফিটার (শহীদ)

৬৬৩। ৭৭০০৬	"	আব্দুল গনি	জিএস-১ (শহীদ)
৬৬৪। ৭৭৩২৪	"	শামছুল আলম	এমটি ফিটার (শহীদ)
৬৬৫। ৭৯২৩০	জেটি	এস এম করিম	জিএস-১ (শহীদ)
৬৬৬। ৭৯২২১	"	মোঃ জহিরুল ইসলাম	ইলেকট্রিঃ ফিটার (শহীদ)
৬৬৭। ৮২৭৪০	এলএসি	আনোয়ার হোসেন	এয়ারফ্রেম মেক: (শহীদ)
৬৬৮। ৮১৭৬৪	জেটি	ইসলাম উদ্দিন	... (শহীদ)
৬৬৯। ৮৩২১৯	এলএসি	নূরুল হক চৌধুরী	আর্ম: মেক: (শহীদ)
৬৭০। ৮০৭১৪	এলএসি	নওজেস চৌধুরী	" (শহীদ)
৬৭১। ৮৩২৭৪	এলএসি	মোঃ আমিন	ইলেকট্রি: মেক: (শহীদ)
৬৭২। ৮৬০৫২	সিনিয়রটেক	হাবিব উল্লা	ইঞ্জি: ফিটার (শহীদ)
৬৭৩। ৮৬৭৪৪	জেটি	আব্দুস ছালাম	এয়ারফ্রেম ফিটার (শহীদ)

মুক্তিযোদ্ধা বেসামরিক কর্মচারী

১।	এম/০০১৭	জনাব	মো: ইউসুফ মিঞা	অধীকক্ষ
২।	পিসি/১২৩	"	সিরাজুল ইসলাম	সাঁটলিপিকার
৩।	পিসি/১৯৮	"	মোঃ আব্দুল মজিদ	উচ্চমান করণিক
৪।	এম/০০৪৩	"	মোঃ আব্দুস সোবহান	উচ্চমান করণিক
৫।	এসকেএস/১৫২৪	"	মোঃ আব্দুল হালিম	এ এস কে
৬।	এম/০০৬৩	"	আমিনউল্লাহ	নিম্নমান করণিক
৭।	এম/০০৬৯	"	আব্দুস সালাম	নিম্ন করণিক
৮।	এম/০১৩০	"	ওসমান গণি	নিম্ন করণিক
৯।	এম/০১৩১	"	আবুল বাশার	নিম্ন করণিক
১০।	এম/০১৩২	"	শহীদ সরওয়ার্দী	নিম্ন করণিক
১১।	এম/০১৭১	"	মকবুল হোসেন	নিম্ন করণিক
১২।	এম/০১৭৩	"	মোঃ আব্দুল হালিশ	নিম্ন করণিক
১৩।	এম/০০৬৮	"	মোঃ জিল্লুর রহমান	নিম্ন করণিক
১৪।	এম/০১৬০	"	হাওলাদার মনিরুল ইসলাম	নিম্ন করণিক
১৫।	আরও/০৭০৩	"	মোঃ সামসুল হক	নিম্ন করণিক
১৬।	এফএফ/২৩০৪	"	আক্তার হোসেন	অগ্নিনির্বাপক
১৭।	এফএফ/২৩১৭	"	সফিকুল ইসলাম	অগ্নিনির্বাপক
১৮।	এফএফ/২৩১৮	"	ইউসুফ আখন্দ	অগ্নিনির্বাপক
১৯।	এফএফ/২৩৩৩	"	কবির হোসেন	অগ্নিনির্বাপক
২০।	এফএফ/২৩৩৪	"	আব্দুস সোবহান	অগ্নিনির্বাপক
২১।	এফএফ/২৩৩৫	"	ফজল মিয়া	অগ্নিনির্বাপক
২২।	এফএফ/২৩৩৬	"	রুহুল আমিন	অগ্নিনির্বাপক
২৩।	এফএফ/২৩৩৭	"	আব্দুর রব	অগ্নিনির্বাপক
২৪।	টিএস/১২৪৫	"	আতিয়ার রহমান	চার্জহ্যান্ড (মেটাল ওয়ার্কার)
২৫।	টিএস/১৩৪১	"	সাহাব আলী	চার্জহ্যান্ড (রাডার ফিটার)
২৬।	টিএস/১৩৫৬	"	নূরুল হুদা	চার্জহ্যান্ড (গ্রাউন্ড সিগনালার)
২৭।	টিএস/১৩৫৩	"	জায়েদুল করিম	মিস্ত্রি সিলেকশন গ্রেড
২৮।	টিএস/১৩৫৪	"	আমির হোসেন	মিস্ত্রি সিলেকশন গ্রেড
২৯।	টিএস/১২৩৩	"	নাজিম উদ্দিন	মিস্ত্রি-১ (ইঞ্জিন ফিটার)
৩০।	টিএস/১৩৬৩	"	সবদের রহমান	মিস্ত্রি-১ (গ্রাউন্ড সিগনালার)

৩১। টিএস/১৩৬৪	"	এমদাদুল হক খান	মিস্ত্রি-১ (গ্রাউন্ড সিগনালার)
৩২। টিএস/১৩৬৫	"	আব্দুস সালাম	মিস্ত্রি-১ (গ্রাউন্ড সিগনালার)
৩৩। টিএস/১৩৬৬	"	আব্দুল ওয়াদুদ	মিস্ত্রি-১ (গ্রাউন্ড সিগনালার)
৩৪। টিএস/১২৬০	"	আব্দুল মোবারক	মিস্ত্রি-১ (মেটাল ওয়ার্কার)
৩৫। সিভি/১২৬০	"	আব্দুল আওয়াল	যান্ত্রিক পরিবহন চালক
৩৬। এমএস/৪০৯৩	"	সামসসুল হক	লস্কর
৩৭। এমএস/৪৬৭০	"	আলী আকবর	পাচক
৩৮। এমএস/৪৭১৩	"	কবির আহমদ	পাচক
৩৯। এমএস/৪২২৩	"	আবুল হোসেন	পিয়ন
৪০। এমএস/৪২১৬	"	সেকেন্দার আলী	লস্কর
৪১। এমএস/৪৯৬০	"	সুদন চন্দ্র দাস	ঝাড়ুদার
৪২। এমএস/৪২৭৪	"	আব্দুস সাত্তার	পিয়ন
৪৩। এমএস/৪৭৬৩	"	সামছুল হক	লস্কর
৪৪। এমএস/৪৬৪৭	"	আব্দুল খালেক	লস্কর ডিপি
৪৫। এমএস/৪৮৪৪	"	মোহাম্মদ হোসেন	ওয়াটার ক্যারিয়ার
৪৬। এমএস/৪২১০	"	আব্দুস সালাম	লস্কর টেন্ডাল
৪৭। এমএস/৪১৭৪	"	হেদায়েত উল্ল্যাহ	লস্কর
৪৮। ডিএইচকিউ/৭৮৩	"	ওসমান গনি	লস্কর

(১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রকাশিত 'বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস' শীর্ষক বইয়ে সন্নিবেশিত)

ঘটনাবহুল '৭৭-এর কয়েকটি দিন : সংবাদপত্রের পাতা থেকে

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ : ছিনতাইকৃত জাপানি বিমানের ঢাকায় অবতরণ।

৩০ সেপ্টেম্বর : বগুড়ায় সেনাবাহিনীর মধ্যে গোলযোগ। নিহত ১, আহত ৩ ও নিখোঁজ ২।

২ অক্টোবর : ঢাকায় সেনানিবাসে সৈন্যদের মধ্যে গুলিবিনিময়। ঢাকা বিমানবন্দরে কর্তব্যরত অবস্থায় বিমানবাহিনীর ১১ অফিসার ও সেনাবাহিনীর ১০ জন নিহত। সেনাবাহিনীর ৪০ জন আহত।

- শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের মোকাবেলা করতে দেশবাসীর প্রতি প্রেসিডেন্টের আহ্বান।
- সেনাবাহিনীর কিছু লোক বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেওয়ায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি মিসরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের অভিনন্দন।

৩ অক্টোবর : প্রেসিডেন্ট জিয়ার সভাপতিত্বে সেনা সদর দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। জাতীয় স্বার্থ ও সশস্ত্র বাহিনীর বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত।

- ঢাকার বিমানবন্দরে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু।

৪ অক্টোবর : উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বগুড়া ও ঢাকার বিমান ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যায় শোক ও দুঃখ প্রকাশ।

৭ অক্টোবর : বগুড়া ও ঢাকায় সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহের জন্য সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিচারের লক্ষ্যে কয়েকটি মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল গঠন। বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের বিচার শুরু।

৮ অক্টোবর : ব্রিগেডিয়ার মহব্বত জান চৌধুরী সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক নিযুক্ত।

১১ অক্টোবর : বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৬০ নেতার সঙ্গে বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘোষণা, 'রাজনীতির ভিত্তি হবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'।

১৪ অক্টোবর : ডেমোক্রেটিক লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নিষিদ্ধ।

১৮ অক্টোবর : বগুড়া ও ঢাকায় সেনা বিদ্রোহের ঘটনায় অভিযুক্ত ৪৬০ জনের বিচার সম্পন্ন। সেনা ও বিমানবাহিনীর ৩৭ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, ২০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৬৩ জন খালাস। অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড।

২৬ অক্টোবর : দুজন বিচারপতিকে নিয়ে বগুড়া ও ঢাকার ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন।

- বগুড়ার ঘটনার বিচার সম্পন্ন : ৫৫ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১৪ জন খালাস।

৯ ডিসেম্বর : এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদের স্থলে এয়ার কমোডর সদরুদ্দিন বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে নিযুক্ত।

***

১১ জানুয়ারি ১৯৭৮ : ঢাকায় সামরিক ট্রাইব্যুনালে আটজনের মৃত্যুদণ্ড।

গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি

দ্য রোল অব মিলিটারি অ্যান্ড মিথ অব ডেমোক্রেসি : এমাজউদ্দিন আহমদ
বাংলাদেশ : দি আনফিনিশড রেভল্যুশন : লরেন্স লিফশুলজ
বাংলাদেশ : এ লিগ্যাসি অব ব্লাড : অ্যান্থনি মাসকারেনহাস
ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দ্য চ্যালেঞ্জ অব ডেভেলপমেন্ট : এ স্টাডি অব পলিটিক্স অ্যান্ড মিলিটারি ইন্টারভেনশন্স ইন বাংলাদেশ : ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ
পলিটিকস অ্যান্ড সিকিউরিটি অব বাংলাদেশ : তালুকদার মনিরুজ্জামান
দ্য বাংলাদেশ রেভল্যুশন অ্যান্ড ইটস আফটারম্যাথ : তালুকদার মনিরুজ্জামান
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস : বাংলাদেশ বিমানবাহিনী
বাংলাদেশের রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১ : ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ)
সামরিক জীবনের স্মৃতি ১৯৬৪-১৯৮১ : ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী খালেকুজ্জামান (অবঃ)
এভিডেন্স : লে: জে: মীর শওকত আলী (চ্যাপ্টার-৪)
বাংলাদেশ ইন ১৯৭৭ : ডিলেমাস অব দ্য মিলিটারি রুলারস-এশিয়ান সার্ভে, ভলিউম ১৮, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮-এম রশীদুজ্জামান
লন্ডন টাইমস : ৫ মার্চ ১৯৭৮
ওয়াশিংটন পোস্ট : ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮
নিউ ইর্য়ক টাইমস - ৩ অক্টোবর ১৯৭৭
ভোরের কাগজ : ২ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ৩ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ৪ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ৫ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ৬ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ৭ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ৮ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ৯ অক্টোবর ১৯৯৭
ভোরের কাগজ : ২৯ অক্টোবর ২০০৬
ভোরের কাগজ : ৩০ অক্টোবর ২০০৬
একুশে পত্রিকা : বর্ষ ৪, সংখ্যা ৫, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রথম আলো : ২৩-০৭-২০১১
প্রথম আলো : ২৪-০৭-২০১১

- বইয়ে ব্যবহৃত অভ্যুত্থানকালীন ছবিগুলো জাপানি বিমান ছিনতাইয়ের ওপর NHK টিভি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র থেকে সংকলিত।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন বিমানবাহিনীর ব্যবহৃত হেলিকপ্টার ও ডিসি-৩ বিমানের ছবি বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংকলিত।